মার্চ ১৯৮৯

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

এবার ফোবস অভিযান

লিখেছেন : বিমান বসু

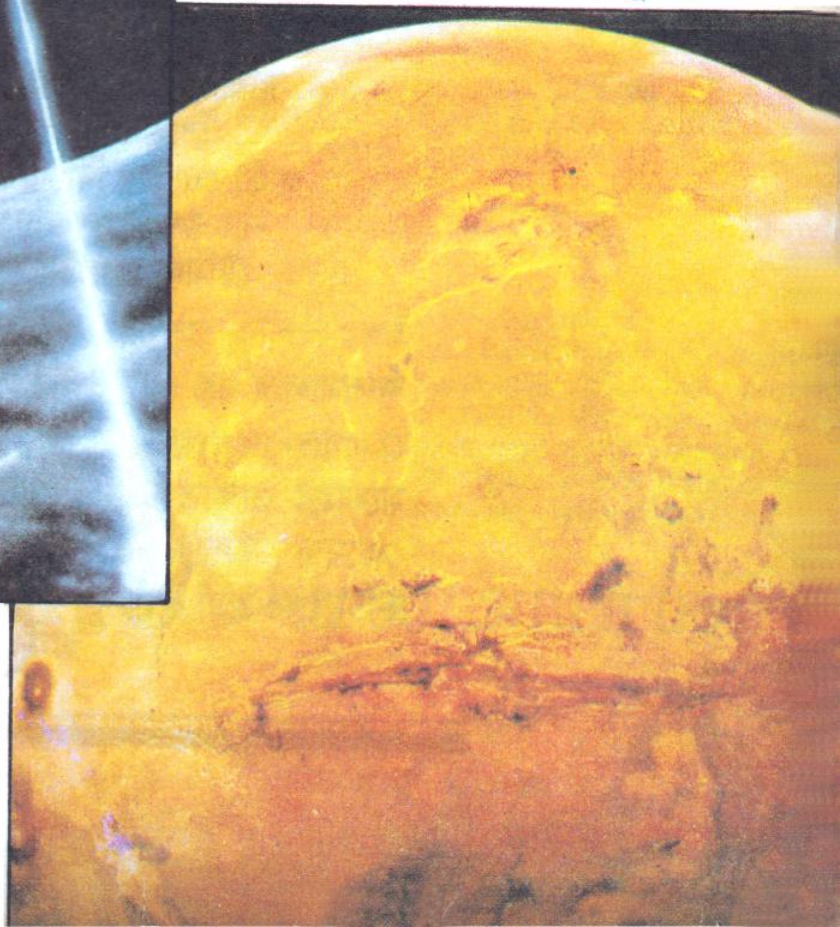

নার্সারী, কিন্ডার গার্টেন ও
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের জন্য

ছবি ছড়া ও গল্পের বই

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের

ছবিতে ছোটদের রামায়ণ ৬্
ছবিতে ছোটদের মহাভারত ১০্
হাসি রাশি ৬্ খেলার সাথী ৬্ হাসি ও খেলা ৬্

অখিল নিয়োগীর
ছবিতে সাধারণ জ্ঞান ১০্

শৈল চক্রবর্তীর
গাড়ী ঘোড়ার বিচিত্র গল্প ১০্

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
টেনিদার কুট্টিমামা ৫্

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর
কথামালার গল্প ৪্

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তর
মনোহর ডাকাত ৬্

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
কচিমুখের ছড়া ৫্

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
ঠাকুরমার ঝুলি ৮্
ঠাকুর দাদার ঝুলি ১০্

দেবাশিস বলের
বাঘ সাপ হাতি ৬্

মনি বাগচির
অমর চরিত কথা ৭্

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

অষ্টম বর্ষ 12 সংখ্যা
মার্চ 1989

সূচীপত্র

চিঠিপত্র ঃ 4
কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর ঃ মিরাণ্ডার বিস্ময় ॥ সমরজিৎ কর 7
প্রচ্ছদ নিবন্ধ ঃ এবারে ফোবস অভিযান ॥ বিমান বসু 31
পড়াশোনা ঃ
গণিতের উৎপত্তি ॥ সমীর কুমার ঘোষ 17 ঃ মজাদার জ্যামিতি ॥ লক্ষ্মীকান্ত বসু 18
বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ঃ বৃষ্টি যখন নামবে ধীরে ॥ কে. সিকদার 36
জীবজন্তু ঃ পাখি আমাদের জ্ঞানের আলো ॥ অরিন্দম চন্দ 41
শরীর-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ঃ মেদ রহস্য ॥ দেবব্রত রায় 39
ইলেক্‌ট্রনিক্স ঃ
ইলেক্‌ট্রনিকস ক্যুইজ ॥ বিপ্লব ব্যানার্জী 15
ফিচার ও ছবিতে গল্প ঃ
দক্ষস্থপতি বাবুই ॥ অজয় হোম 11 ঃ আকন্দ ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 58
বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 12 ঃ প্রাণী বিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী 55 ঃ কীটপতঙ্গের কথা ॥ অলয় ঘোষাল 14 ঃ ক্যুইজ কনটেস্ট ও অন্যান্য প্রতিযোগিতা 56 ঃ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সমাধান 57 ঃ বিজ্ঞানের খবর ॥ যুধাজিৎ দাশগুপ্ত 13
খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23 ঃ যুগের ভিতর যুগ ॥ গৌতম কর্মকার 43
আবিষ্কারের গল্প ঃ মানব সভ্যতার বন্ধু কালি ॥ ধ্রুব মুখোপাধ্যায় 27
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ বিজ্ঞানীর টুকিটাকি ॥ অমরনাথ রায়, মানস কুমার চিনি 16
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ঃ বরলী রেকর্টরি কি হানাবাড়ি ॥ কাজল ভট্টাচার্য 19
কার্টুন ঃ রেবতীভূষণ 50
ধারাবাহিক রচনা ঃ
অনিয়মের রহস্য ॥ অদ্রীশ বর্ধন 22 ঃ নীল সাগরে রহস্য ॥ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 34
জ্ঞান-বিজ্ঞানের রচনা ঃ জানা-অজানা ॥ মানস কুমার চিনি 0 ঃ রোলারকে টানব না ঠেলব ॥ তাপস ভৌমিক 10 ঃ টি. ভি. রেডিও ও সিনেমার প্রভাব ॥ গিরীশ রায় বর্মন 66 ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ ॥ বরুণ মজুমদার 30
কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ ঃ
সফল উত্তরদাতাদের নাম 63 ঃ বলতে পারো কেন ॥ সুধাংশু পাত্র 59 ঃ রঙিন ফট্‌কিরি ॥ অপরাজিত বসু ঃ মশা তাড়ানোর যন্ত্র ॥ শুভাশিস বিশ্বাস 51
হাই-ফাই প্রি-অ্যাম্প ॥ সুব্রত মজুমদার 63 ঃ বিজ্ঞান সংবাদ 49

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
ভারতীয় যাদুঘরের 175 বছর

লিখবেন
কিন্নর রায়

প্রধান সম্পাদক ঃ সমরজিৎ কর
সম্পাদক ঃ রবীন বল
সহ সম্পাদক ঃ জয়ন্ত দত্ত

প্রচ্ছদ ঃ অলয় ঘোষাল ॥ **অন্যান্য ছবি ঃ** অলয় ঘোষাল ও নিমাই নন্দী

চিঠিপত্র

পড়াশোনা

জানুয়ারী '88 সংখ্যায় প্রকাশিত আমার একটি নিবন্ধের ছাপার ভুলকে কেন্দ্র করে গত জুলাই '88 এবং ডিসেম্বর '88 সংখ্যায় প্রকাশিত দুটি পত্র নজরে এলো। ছাপার ভুলের ওপর লেখকের যে কোনো হাত নেই এবং দু-এক ছত্র আগে পরে অনুধাবন করলেই কোন্ ভুল ছাপার তা ধরা যায়—এই অভিজ্ঞতা প্রথম পত্র লেখকের নেই। দ্বিতীয় পত্রে আমার উত্তরের ধাপগুলি বিস্তৃত করা হয়েছে মাত্র। পরীক্ষার খাতায় আমার উত্তরই (ছাপার ভুল ব্যতীত) যথেষ্ট। উচ্চতা এবং দূরত্ব বিষয়ক সমস্যাদি প্রাগ্রসর ছাত্রছাত্রীরাই প্রস্তুত করে থাকে, তাদের পক্ষে এই বিস্তৃতি বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য কোনো ছাত্র/ছাত্রী যদি মনে করে ধাপগুলোর বিস্তৃতির প্রয়োজন তাহলে সে অবশ্যই করে নেবে এবং সেটি হবে তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

ডঃ অসীম মুখোপাধ্যায়, 28/4/2/1B শ্রী মোহন লেন, কলিকাতা-26.

আমি কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। গত September 1988 সংখ্যার চিঠিপত্র বিভাগটি পড়লাম। 'পাপিয়া পাল' জুলাই 1988 সংখ্যায় প্রকাশিত 'ক্লোরিন' সম্বন্ধীয় লেখায় কিছু ভুল উল্লেখ করেছেন কিন্তু তিনি আরও কিছু ভুল উল্লেখ করেননি।

(i) শ্রী অমরনাথ রায় লিখেছেন F-এর পারমানবিক 19·0 কিন্তু আমার মতে F-এর পারমানবিক গুরুত্ব 18·9984 লেখাই যুক্তিযুক্ত কারণ 19·0 উহার ভর সংখ্যা।

(ii) তিনি লিখেছেন মৌলটিকে F^{19} চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় আমার মতে $9F^{19}$ হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

(iii) তিনি একটা ভুল করেছেন। অবশ্য এটা হয়ত ছাপারই ভুল। 15 পৃষ্ঠার 6নং paragraph-এর তৃতীয় লাইনে উল্লেখ করা আছে-ভূত্বকে প্রায় 0072% ক্লোরিন আছে কিন্তু উহা 0·072% হওয়া যুক্তিযুক্ত।

আমার মতে এই ক্ষুদ্র ভুল গুলির নজর দেওয়া প্রয়োজন।

অসীম বিশ্বাস C/o অবিনশ্বর বিশ্বাস vill—বগুলা কলেজ পাড়া P.O.—বগুলা Dt.—নদীয়া

পড়াশুনা বিভাগে শ্রীসমীর কুমার ঘোষের লেখা "রোধ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" তিনি ওহমের সূত্র বলতে গিয়ে বলেছেন, "পরিবাহীর উষ্ণতা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ মাত্রা ; পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতী হবে।" কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রথমতঃ তিনি শুধু পরিবাহী কথাটা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু যদি কোনো পরিবাহী সমসত্ত্ব না হয়, তবে সেক্ষেত্রে তো রোধ ভিন্নও হতে পারে। আবার শুধু তড়িৎ-প্রবাহ মাত্রা বলা হয়েছে। এটা কিন্তু শুধুমাত্র একমুখী তড়িতপ্রবাহ [D.C]র ক্ষেত্রে ওহমের সূত্র প্রযোজ্য।

তাহলে, সংশোধিত রূপে সূত্রটি দাঁড়ায়," তাপমাত্রা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কোনো সমসত্ত্ব ও সমদৈশিক পরিবাহীর মধ্যে প্রবাহিত একমুখী [D.C.] তড়িৎ-প্রবাহ উহার দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতী।"

আরেকটি কথা, এই সংশোধিত সূত্রটি আমাদের পাঠ্যবইতেও দেখা যায় না। যদিও ঐ সংশোধিত সূত্রই নির্ভুল।

আশা করি, এক বিষয়ে লেখক নিশ্চই তাঁর মতামত দেবেন।

সোমনাথ ভট্টাচার্য, 59/E, প্রতাপাদিত্য রোড। কলিকাতা-26

মডেল নির্মাণ

ডিসেম্বর 1988 সংখ্যায় "নিজে নিজে কর বিভাগে" কম খরচে হাই-ভোল্টেজ (পাতা-61) এ-তে বলা হয়েছে ট্রানজিস্টারের Base, Emiter এবং Collector ঠিকমতো বসাতে। কিন্তু, সার্কিট ডায়াগ্রামে কোন নির্দেশ দেওয়া নেই। কোথায় Base, Emiter ইত্যাদি বসবে জানালে উপকৃত হবো। এবং মডেলটি বানিয়ে আনন্দিত হবো।

সুমিতা মুজমদার
S.D.O.T. Bankura.

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর গত ডিসেম্বর সংখ্যায় 'নিজে নিজে কর' বিভাগে বেশ কয়েকটি ভুল চোখে পড়ল। ঐ বিভাগে শ্রী দেবকুমার রায় লিখিত "কম খরচে হাইভোল্টেজ" এই শিরোনামে যে ইলেকট্রনিক্স মডেলটি দেওয়া হয়েছে, তাতে বেশ কয়েকটি ভুল আছে। ভুলগুলি তুলে ধরলাম। (a) রডের চিত্রটি ভুল। (b) কনডেন সারের সংকেতটি ভুল। (c) রেজিস্টান্সের সংকেতটি ভুল। (d) ট্যান্সফরমারের আয়রণ কোর দেওয়া হয় নি। (e) সুইচের সিম্বলটি ভুল। (f) কি ধরনের ট্যান্সফরমার ব্যবহার করতে হবে তার উল্লেখ নাই। (g) ট্যানজি-

স্টারের ইলেকট্রোডের কোন সংকেত নাই।

পল্লব মোহান্ত, 'পলাশী পাড়া নিউ সাইন্স ক্লাব', পলাশী পাড়া, তেহট্ট, নদীয়া

বিশ্বাস অবিশ্বাসের বাইরে

গত ডিসেম্বর 88 সংখ্যায় অদ্রীশ বর্ধন মহাশয়ের রচনা বিশ্বাস অবিশ্বাসের বাইরে' রচনার বিরুদ্ধে কিছু পাঠক নিজেদের মতামত দিয়েছেন। তারা বলেছেন যে রচনাটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং তারা আরো বলেছেন যে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান এর মত বিজ্ঞান পত্রিকায় এমন বিজ্ঞান বিরোধী রচনা প্রকাশ করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। আমি কিন্তু তাদের সেই মতামতে সম্পূর্ণ বিরোধী। আমার মতে অভিরূপ দাশগুপ্ত মাত্র কিছু সংখ্যক পাঠকের মতামতকে প্রকাশ করেছেন। এর বাহিরে যে আরো বহু পাঠক আছেন তা তিনি ভুলেই গেছেন। তাছাড়া এক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে পৃথিবীতে এমন কোন ঘটনা আছে যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দ্বারা মেলে না। তাই এই সকল রচনা যে কোন উৎকণ্ঠী পাঠককে উৎসাহিত করবে। তাছাড়া এই বইটার নাম "কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানও" বটে। তাই অভিরূপ দাসগুপ্তের মত পাঠকের কাছে অনুরোধ যে তারা যেন কিছু সংখ্যক পাঠকের মতামত নিয়ে কোন রচনার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ না করেন যা অনুসন্ধিৎসু পাঠককে বিব্রত করে।

মুকুলেশ দেবনাথ, বেলঘরিয়া উচ্চ-বিদ্যালয়, দশম, কলিকাতা,

জানুয়ারি 1988 সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে অদ্রীশ বর্ধন মহাশয়ের ধারাবাহিক রচনা—'বিশ্বাস অবিশ্বাসের বাইরে'। প্রথম থেকেই পড়ছি। কিন্তু বিজ্ঞান সচেতন পাঠক হিসেবে 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের' মতো বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় বিশ্বাস অবিশ্বাসের বাইরের কোন লেখা আমি আশা করি না। বিজ্ঞানমনস্ক কোন পাঠকই তা করেন না। বিজ্ঞান সমস্ত রহস্যময়তা দূর করে। আর সমস্ত রহস্যের উৎস অজ্ঞতা। আবহমান কাল থেকে মানুষ এই অজ্ঞতা দূর করার কাজে নিমগ্ন। আর তার প্রধান হাতিয়ার বিজ্ঞান। তাই আজকের দিনে অদ্রীশবাবুর রচনাটি যা আমাদের চিন্তাধারাকে নিয়ে যায় রহস্যের পিছনে তা বিজ্ঞান বিরোধী।

তীর্থঙ্কর ঘোষ, রূপনারায়ণপুর বর্ধমান।

ডিসেম্বর সংখ্যায় 'অলৌকিকের আঙিনায়' নিবন্ধে অদ্রীশ বর্ধন পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়েও রাসপুটিনের মারা না যাবার ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন 'প্রকৃতি অথবা বিজ্ঞানের কানুন দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রাসঙ্গিক হিসেবে চিঠি লিখছি—

বস্তুতঃ পটাসিয়াম সায়ানাইড একক ভাবে বিষক্রিয়া বিহীন। পটাসিয়াম সায়ানাইড খাবার পর Stomach-এর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCL)-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি হয় হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড (HCN) নামে একটি যৌগ—উৎপন্ন এই হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডটাই আসলে বিষ—পটাসিয়াম সাইনাইড নয়।

Achlorohydria বলে একটা ব্যাপার আছে যাতে কোনো কোনো ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে পাকস্থলীতে এই অ্যাসিডটি থাকে না। সাধারণতঃ এ ধরণের লোকেরা পটাসিয়াম সায়ানাইড খেলেও কিছু হবে না।

পটাসিয়াম সায়ানাইড নিঃসন্দেহে একটি মারাত্মক বিষ সেইহেতু এর সম্পর্কে একটি অদ্ভুত ভয়প্রদ জনশ্রুতি আছে যে জিবে ছোঁয়ানো মাত্রই নাকি এতে মৃত্যু ঘটে। প্রাসঙ্গিক হিসেবে বলা হয় কেউ একজন নাকি এটি মুখে দিয়ে 'S' অক্ষরটি ছাড়া আর কিছুই লিখে যেতে পারেন নি। এখন এই 'S' কিসের জন্য Sour নাকি Sweet বোঝা গেল না। কিন্তু আসল ঘটনা —এটি খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে ঠিকই তবু 2 থেকে 10 মিনিটের আগে কিছু হয় না যখন হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডই খাওয়া হয়। আর যখন পটাসিয়াম সায়ানাইড খাওয়া হয় তখন সময় লাগে মোটামুটিভাবে 30 মিনিট।

দেবব্রত রায়, এল এম. হোস্টেল, 2. ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা-37

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে' শীর্ষক রচনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আর কোন চিঠিপত্র প্রকাশিত হবে না।—সম্পাদক

কলমের আবিষ্কারক

গত ডিসেম্বর 1988 সংখ্যার কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান লতিকা দত্তের 'কলম কে আবিষ্কার করেন' লেখাটিতে কে কলম আবিষ্কার করেছেন সেটাই লেখা হয়নি। তিনি লিখেছেন, "আধুনিক যুগের ফাউন্টেন পেন বা ঝরণা কলম (Fountain pen) 1880 তে সর্বপ্রথম ইউনাইটেড্ স্টেটস (United States) এ তৈরী হয়।" কিন্তু আমেরিকার ওয়াটারম্যান আবিষ্কৃত হয় 1884 খ্রীষ্টাব্দে। আর তারপরে যে নিব ও কলমের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতো বলপেন বা ডট্ পেনের—ফাউন্টেন পেনের নয়। ইতি।

কানাই লাল সাহা, শিবাজীলাল সাহা শ্রীকলোনী (উত্তর), কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিমদিনাজপুর।

এই পত্রিকার কয়েকটি বিষয় আমার বেশ প্রিয়, তার মধ্যে "আবিষ্কারকের

গল্প" বিষয়টি খুবই প্রিয়, কিন্তু একটি ভুল পরিলক্ষিত হচ্ছে। লতিকা দত্ত মহাশয়া পত্রিকায় (ডিসেম্বর) 22 পৃষ্ঠায় এই শিরোনাম দিয়েছেন যে "কলম কে আবিষ্কার করেন ?" শিরোনাম থেকে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে কোন ব্যক্তি নিশ্চয় কলম আবিষ্কার করেছিল, কিন্তু লেখিকা কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন নি, উল্লেখ করেছেন ইউনাইটেড স্টেটস এর। কিন্তু এটা কি ঠিক ? আবার গত জুন 83তে "থার্মোমিটার কে আবিষ্কার করেন ?" এই শিরোনামে গ্যালিলিওর নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এখানে কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি। যাই হোক ফাউনটেন পেন ঝরণা কলম আবিষ্কার করেন মার্কিন বিজ্ঞানী ওয়াটার ম্যান। ননীগোপাল আইচের লিখা "জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা" নামক বইতে এই নামটি রয়েছে।

শ্রী বিভাস কুমার মাইতি, বাজকুল কিসমত বাজকুল, মেদিনীপুর।

গাছপালা

গত ডিসেম্বর '88 সংখ্যায় 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশিত 'দুর্গাপ্রসন্ন মুখার্জী'র পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বক্তব্য রাখছি।

1) তুলসী গাছ, সর্দি কাশি নিরাময়ে খুবই ফলদায়ক এবং বেদনা প্রশমণেও এটি যথেষ্ট সাহায্য করে। এগুলি নিজেরা পরীক্ষা করে দেখলেই বোঝা যাবে।

2) 'বৈজ্ঞানিক নাম' লেখার ক্ষেত্রে পত্রলেখকের মতই সঠিক। অর্থাৎ, গনের আদ্যক্ষর বড় হরফে ও প্রজাতির আদ্যক্ষর ছোট হরফে লেখা হয়। 'জানা-অজানা'র লেখক অনুপম বড়াল তুলসী গাছের বৈজ্ঞানিক নাম যা দিয়েছেন, তা আমার বায়োলজি বইয়ের নামের সাথে মিলছে না, আমার বইতে দেওয়া আছে—Ocimum Satirum বইটি রবীন্দ্রনারায়ণ পালের লেখা, (নবম ও দশম শ্রেণী।) কোনটি সঠিক জানালে উপকৃত হব।

জুই কুণ্ডু শুঁড়া ২য় লেন, বেলেঘাটা কলিকাতা-10

শরীর স্বাস্থ্য

এই বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা ছোট বড় সকলেরই পাঠের প্রয়োজন। কিন্তু সেপ্টেম্বর 88 ও ডিসেম্বর 88 পত্রিকায় কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করলাম।

(1) গত জুলাই 88 সংখ্যায় ক্যুইজ গ্রেড-I-এর 7নং প্রশ্ন ছিল সুস্থ মানুষের 100 ml. রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কতো থাকে ? এর উত্তরে সেপ্টেম্বর 88 সংখ্যায় বলা হয়েছে সুস্থ মানুষের 100 ml. রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমান 1·5 গ্রাম। কিন্তু আমরা পড়েছি সুস্থ মানুষের 100 ml. রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমান থাকে 12 থেকে 14·5 গ্রাম।

(2) ডিসেম্বর 88 সংখ্যায় বিচিত্র সংবাদে (37 পাতা) বরুণ কুমার দাস লিখেছেন (আশ্চর্য্য-বটে) "লণ্ডনের প্রাকৃতিক ইতিহাস যাদুঘরে একটা মানুষের মাথায় খুলি সংরক্ষিত আছে। উত্তর রোডেশিয়ার এক গুহা থেকে উদ্ধারকৃত এই খুলিটির বাঁ পার্শ্বে নিখুঁত একটা গোল ফুটো আছে। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে বলেছেন খুলিটা 80,000 (আশি হাজার) বছর আগেকার একজন গুহা মানবের এবং গুলির আঘাতে এ ফুটোটা হয়েছে। চল্লিশ হাজার বছর আগেকার গুহা-মানবের হাতে বন্দুক এটা ভাবতে যেমন অবাক লাগে তেমনি আশ্চর্যও বটে।"

—উনি দু জায়গায় দুটি সাল ব্যবহার করেছেন যার ব্যবধান চল্লিশ হাজার বছর। এই দুটি সালের মধ্যে কোনটি ঠিক ? না কি ছাপার ভুল ? দয়া করে যদি এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন।

অশোক জানা, 90, আই. আর. বেলিলিয়স লেন, হাওড়া-1

চায়ের রাসায়নিক গুণাগুণ

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত সুজিত মুখোপাধ্যায় এর লেখা Oct-Nov 88 সংখ্যাটির প্রচ্ছদ নিবন্ধে চা-এর রাসায়নিক গুণাগুণে বা Chemical composition-এ বলা হয়েছে যে চা এর পাতায় প্রধানত 13-18% ট্যানিন থাকে, কিন্তু আমার মনে হয় অর্থ্যাৎ Pharmacology হইতে জানতে পারি যে উহাতে $2\frac{1}{2}$—4% ক্যাফেন থাকে। এবং ঐ Caffene থাকার ফলে মানুষকে সাময়িক স্ফূর্তি প্রদান করে, এবং ক্লান্তি দূর করে। তাই Caffene লেখা উচিত ছিল।

মহঃ আবদুল বাসিত, পাথরকাছি, করিমগঞ্জ, আসাম

A. C. ও D. C.

"মাননীয় সুধাংশ পাত্র মহাশয় কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার ফেব্রুয়ারী 1989 সংখ্যার 64 পৃষ্ঠায় বর্ণিত A.C এবং D.C সংক্রান্ত Abbreviation এর ব্যাখ্যা আমার কাছে অত্যন্ত মামুলি বলে প্রতিভাত হচ্ছে। কারণ আমরা সাধারণতঃ A C current এবং D.C current বলতে খুবই অভ্যস্থ এবং সেই সুবাদে A.C. ও D.C Abbreviation এর অত্যন্ত সঠিক, সহজ এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা হওয়া উচিত। A.C Current = Alternate Cycle Current আর D.C. Current = Dircct + Cycle current। তাই না কি ?"

বিপ্লব ব্যানার্জী
যাদব ঘোষ রোড, সরশুনা, কলি-61

মিরাণ্ডার বিস্ময়

সমরজিৎ কর

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এবার খানিকটা মুশকিলে পড়েছেন। সৌরজগতে নয়টি গ্রহ। বুধ এবং শুক্রের, কোন উপগ্রহ বা চাঁদ নেই। এই দুটি গ্রহ ছাড়া আর সব গ্রহেরই উপগ্রহ আছে। পৃথিবীর একটি। মঙ্গলের দুটি। বাকিদের অনেকগুলি করে। গত পনের বছরে এই সব উপগ্রহ নিয়ে কত কথাই না বলেছেন তাঁরা। তাঁদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল, পৃথিবী এবং মঙ্গলের উপগ্রহ ছাড়া বাকি উপগ্রহ-গুলির মিল রয়েছে যথেষ্ট। এই ধারণাটা নিয়েই এখন যত মুশকিল।

যেমন ধরো, মিরাণ্ডা। ইউরেনাসের যে পাঁচটি বৃহত্তম উপগ্রহ, মিরাণ্ডা তাদের মধ্যে একটি। এই উপগ্রহটি আবিষ্কার করেন মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞাসী গেরার্ড সি. কুইপার।

আবিষ্কারের পর মিরাণ্ডাকে নিয়ে জ্যোর্তি-বিজ্ঞানী যে খুব মাথা ঘামিয়েছেন, সে কথা বলবো না। এটুকুই শুধু তাঁরা জানতেন, মিরাণ্ডা কাছাকাছি দূরত্বের এক পথ ধরে ইউরেনাসকে পরিক্রমণ করে ; পৃথিবী পৃষ্ঠে বসান দূরবীনে এটিকে দেখায় অত্যন্ত অস্পষ্ট একটি আলোক বিন্দুর মত। ব্যস, আর বেশি কিছু নয়।

কিন্তু 24 জানুয়ারি, 1986-তে ঘটল একটি নাটকীয় ঘটনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার নাম ন্যাশনাল অ্যাণ্ডমিনিস্ট্রেসন বা সংক্ষেপে 'নাসা', ভয়েজার-2 নামে নামার মানবআরোহীহীন একটি মহাকাশ যান ঘণ্টায় 32000 মাইল বেগে ইউরেনাসের দূরবর্তী আকাশ পথে উড়ে যাচ্ছিল ওই দিন। তার ক্যামেরা নজর রাখছিল গ্রহটির বলয় এবং উপগ্রহগুলির উপর। বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলি কয়েক দিনের মধ্যেই পৃথিবীর গবেষণাগারে চলে আসে। তাদের মধ্যে মিরাণ্ডার ছবিও ছিল। সেই ছবিতে ধরা পড়ল উপগ্রহটির স্পষ্ট চেহারা, তার ভূপৃষ্টের স্বরূপ। মিরাণ্ডার এমন স্পষ্ট চেহারা এর আগে আর কখনো ধরা পড়ে নি।

মিরাণ্ডার ওই ছবিগুলি কমপিউটারের সাহায্যে সম্প্রতি পরীক্ষা করে দেখেছেন 'নাসার বিজ্ঞানীরা' সেই সঙ্গে

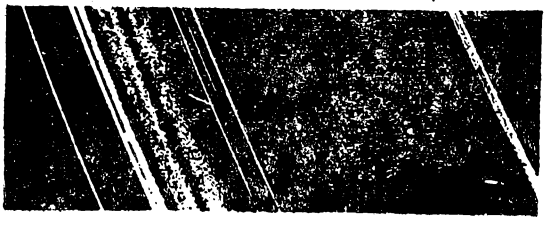

ইউরেনাস-এর বলয়

কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েরও বিজ্ঞানী। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম তুসনের অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রহ-ভূতাত্ত্বিক (Planetary geologist) রবার্ট জি স্টর্ম ছবিগুলি পরীক্ষা করে বলেছেন, সৌর জগতে গ্রহ উপগ্রহ গ্রহানু অ্যাসটেরয়েড মিলিয়ে যত রকম বস্তু দেখা যায়, মিরাণ্ডা তাদের চেয়ে যেন আলাদা। তার বুকে এমন কিছু কিছু ব্যাপার দেখা গেছে যা আর কোথাও দেখা যায় নি।

ব্যাপার বলতে যা বলা হয়েছে, সত্যিই তা ভাবিয়ে তুলেছে বিজ্ঞানীদের। যেমন ধরো, মিরাণ্ডার ব্যাস মাত্র 300 মাইল। অর্থাৎ আয়তনে আমাদের চাঁদের সাত ভাগের এক ভাগ। উপগ্রহটির এক পাশে রয়েছে বিরাট একটি এলাকা। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীরা এটিকে বলছেন পুরনো অঞ্চল, সেখানে দেখা গেছে অসংখ্য জ্বালামুখ বা গহ্বর। সম্ভবত আকাশ থেকে অতিকায় বস্তু পিণ্ড এসে মিরাণ্ডার ভূপৃষ্ঠে আঘাত করে। সেই আঘাতের দরুণই সৃষ্ট হয়েছে ওই সব গহ্বর। চাঁদের পিঠেও এ ধরনের গহ্বর রয়েছে। তবে মিরাণ্ডায় তাদের সংখ্যা অনেক বেশি, এ ছাড়া রয়েছে অজস্র পাহাড় পর্বত। আবার আর একটি অঞ্চল দেখা যায়। যে দিকটি অনেকটা সমতল। যেখানে জ্বালামুখ বা গহ্বরের সংখ্যা অনেক কম। মনে হয় সৃষ্টির পর থেকে এই অঞ্চলে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু তাই নয়। পুরনো এবং নতুন অঞ্চলে গহ্বরগুলির চরিত্রও যেন ভিন্ন। যে ধরনের বস্তুর আঘাত পুরনো অঞ্চলে জ্বালামুখ তৈরি করেছে, সম্ভবত

নতুন অঞ্চলের জ্বালামুখ তৈরিতে তাদের কোন ভূমিকা ছিল না! তারা তৈরি হয়েছে অন্য কোন ধরনের বস্তুর আঘাতে।

পৃথিবীর মত মিরাণ্ডায় কোন শক্তির উৎস নেই। কম বয়েসে এই উপগ্রহটির অভ্যন্তরে হয়ত চলত পারমাণবিক বিক্রিয়া। সেই বিক্রিয়ার দরুন তৈরি হত উত্তাপ শক্তি। সেখানে এখন আর সে ধরনের কোন বিক্রিয়া ঘটে না। তাই উপগ্রহটির অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এখন অতিশীতল একটি পাথরের মত।

মিরাণ্ডা ছাড়া ইউরেনাসের আর চারটে উপগ্রহ হল আমব্রিয়েল, ওবেরন, টাইটানিয়া এবং এরিয়েল।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন যখন গ্রহ উপগ্রহগুলি তৈরি হয় ওই সময় ওই সব অঞ্চলে বিচরণ করত অজস্র বস্তু খণ্ড। অসটোরয়েডের মত। তাদের কারোর আয়তন ছিল ক্ষুদ্র, কারোর অতিকায়। ইউরেনাসের উপগ্রহগুলির কিছু কিছু অঞ্চল ভেঙ্গে যায়। ভাঙ্গা অংশগুলি ছড়িয়ে পড়ে মহাকাশে। আবার কোন কোন অ্যাসটেরয়েড উপগ্রহগুলির মধ্যে পুঁতে যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, অন্য চারটে অতিকায় উপগ্রহের তুলনায় মিরাণ্ডায় গহ্বর দেখা গেছে সব চেয়ে বেশী। কেন এমন হলো সেটাই বিজ্ঞানীদের কাছে এখন বড় একটি রহস্য।

মিরাণ্ডার পৃষ্ঠভাগ অত্যন্ত শীতল। তাপমাত্র −330 ডিগ্রি ফারেনহাইট। এই অবস্থায় যদি সেখানে বরফও থাকে, সেই বরফ কখনোই তৈরি করতে পারে না। ভয়েজারের পাঠান ছবি দেখে অর্থাৎ হিমবাহ বলতে যা বোঝায় সেখানে তা নেই। অথচ কোন কোন অঞ্চল এতই মসৃণ যেন মনে হয় এক সময় সেই সব অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে চলেছিল হিমবাহ। তার ঘর্ষণই সৃষ্টি করছে এমন মসৃন অঞ্চল। এটাও একটি রহস্য।

আমাদের চাঁদের একটি দিক সব সময় পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকে। তার বিপরীত কখনোই পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। মিরাণ্ডার অবস্থাও এখন তাই। তারও একটি দিক ইউরেনাসের দিকে থাকে অপর দিকটি থাকে বিপরীত দিকে। তবে জ্যোতির্বিদদের ধারণা অতীতে মিরাণ্ডার ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম। নিজের অক্ষের চার পাশে আবর্তন করার সময় তার সমস্ত দিকই সময়ে সময়ে ইউরেনাসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিত। এখন কেন তা ঘটে না বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারেন নি।

সত্যি কথা বলতে কি, মিরাণ্ডাকে নিয়ে, এখন অনেক প্রশ্ন।

জানা অজানা মানসকুমার চিনি

লাংফিশ

মাছেদের মধ্যে কুম্ভকর্ণ কে? অবাক হচ্ছো তাই না। এ ব্যাপারে এগিয়ে আছে লাংফিশ নামে এক ধরনের সামুদ্রিক মাছ। পৃথিবীতে এই প্রাণীটি প্রথম জল থেকে ডাঙায় উঠে আসে একটু নিরিবিলিতে ঘুমোবার আশায়। গত তিরিশ কোটি বছরে নিজের স্বভাব একটুও বদলায়নি ওই প্রাণীটি। এখনও প্রাণীটি বছরে 7/8 মাসের বেশি ঘুমিয়ে থাকে। বর্ষার সময় কেবল জলে কাটায়। বৃষ্টি শেষ হলে তীরের মাটি গর্ত করে ঘুমোয় ওরা। জলে ও ডাঙ্গায় দু'জায়গায় শ্বাসকার্য দিব্যি চালায় এরা। ফুসফুস এবং কাণকো দুইই আছে এদের। এই ঘুমানো নিয়ে ফিশম্যান গবেষণা করে দেখেছেন ঘুমানোর সময় ওদের শ্বাস প্রশ্বাসের মাত্রা কমে যায় ভীষণ রকম। কমে যায় হৃদ স্পন্দন এবং রক্তচাপ ঘুম মানে কেবল স্নায়বিক ক্রিয়াকর্মের কয়েকটি সুইচ অফ করা নয়।

একৃরাণ

রোগীর বুকের উপর একটি প্লাস্টিক গদি লাগিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে অসিলোগ্রাফের পর্দায় ফুটে ওঠে স্পন্দনশীল হৃৎপিণ্ডের ছবি। রোগী শুধু অনুভব করেন গদির স্পর্শ, তাকে অন্য কোন ঝুকির মধ্যে পড়তে হয় না। অন্যদিকে ডাক্তার নিজের চোখে দেখতে পান রোগীর হৃৎপিণ্ড কেমন কাজ করছে। এই অভিনব ব্যবস্থাটির নাম একৃরাণ! এটি একটি "ইকো কার্ডিওস্কোপ"। পর্দায় ফুটে ওঠে সেকেণ্ডে 180 ছবি বেগের হৃৎপিণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের ছবি আঠারো লাইনের ও দুই বেধের।

মেচেদা রেল কলোনি, মেচেদা,
মেদিনীপুর, পিন কোড নং-721137

যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন

১। যদি দু সপ্তাহেরও বেশি আপনার লাগাতার কাশি থাকে অথবা যদি দেখেন স্প্যুটাম বা থুতুর সঙ্গে রক্ত আসছে তবে হয়তো আপনার ফুসফুসে টি. বি হয়ে থাকতে পারে।

২। কাছাকাছির প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডিস্পেন্সারি অথবা টি. বি. সেন্টারে গিয়ে নিজেকে -বিশেষ করে স্প্যুটাম পরীক্ষা করান।

৩। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারিত সময় পর্যন্ত নিয়মিত ওষুধ খেলে যক্ষ্মা রোগ সেরে যায়।

৪। রোগ সারানোর চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাই ভাল। তাই আপনার সন্তানকে বি.সি.জি. টীকা লাগিয়ে নিন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো (ডি.জি.এইচ.এস)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, কোটলা রোড
নিউ দিল্লী-১১০০০২

davp 88/729 BEN

রোলারকে টানব, না ঠেলব ?

তাপস ভৌমিক

প্রশ্নটা করেছিল আমার ছোট ভাই, রকি। পরে অবশ্য প্রশ্নটা আমারও প্রশ্ন হ'য়ে দাঁড়ায়। সেদিন যখন স্কুল থেকে ফিরছিলাম, তখন আমাদের গ্রামে বিদেশী সংস্থার সহযোগিতায় যে হাসপাতালটি তৈরি হয়েছিল তার রাস্তা নির্মাণের কাজে, শ্রমিকদের রোলারকে টানতে দেখে, ছুটতে ছুটতে এসে তার এই প্রশ্ন আমার কাছে। প্রশ্নটা শুনেই কেমন যেন রাগ হচ্ছিল ওর ওপর। কারণ, উত্তরটা আমার আদৌ জানা ছিল না। তাই বকাবকি করতে ও চুপচাপ চলে গেল আমার কাছ থেকে। কিন্তু ওর প্রশ্নটা ? সেটা রয়ে গেল আমার মনের মধ্যে। মনে মনে নিজের উপর ধিক্কার জন্মালো। মনে ভাবলাম, সত্যিই তো, রকি খুব সুন্দর একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমি তো অনেকবারই এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু ভেবে দেখিনি, কেন রোলারকে টানা হয়, কেন একে ঠেলা হয় না। তাই খাওয়া-দাওয়া সব ছেড়ে ছুটলাম স্কুলের অভিমুখে। অবশেষে ঘর্মাক্ত দেহে 3 মাইল পথ ভেঙ্গে পৌঁছালাম স্কুলের হোস্টেলে সুপ্রকাশ বাবুর রুমে। তিনি সবে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসেছেন। ঘর্মাক্ত দেহে ও লজ্জিত মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপারটা। আমি লজ্জিত মুখে প্রশ্নটা করলাম তাঁকে। তিনি শুনে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, এই তো আমরা যে বিজ্ঞানের ছাত্র, আমরা যে সব কিছুকে যুক্তি তর্ক দিয়ে, বিচার বিবেচনা দিয়ে, না বুঝে গ্রহণ করব না, তার প্রমাণ এখানেই। এখানেই আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার সার্থকতা। আমরা যদি আমাদের সামনে ঘটে চলা বিষয়গুলোকে যুক্তি-

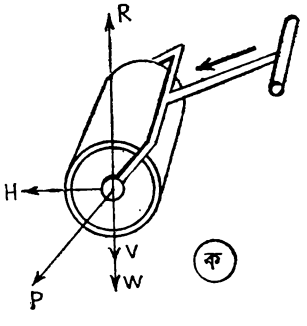

তর্ক দিয়ে বিচার না করে, শুধু হচ্ছে বলেই গ্রহণ করি তাহলে আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার মূল্য কি ?

তাই তিনি ছবি এঁকে ব্যাপারটার সত্যতা নিখুঁতভাবে আমার মনের মনিকোঠায় গেঁথে দিলেন অতি সহজে।

তিনি বললেন, রোলারকে ঠেলার সময় আমরা রোলারের হাতলে যে বল প্রয়োগ করি তা মাটির উপর নিম্নাভিমুখে তির্যক ভাবে পড়ে (চিত্র ক)। এর উল্লম্ব উপাংশটি নিম্নাভিমুখী ক্রিয়া করে। রোলারের ওজন এবং প্রযুক্ত বলের এই উপাংশটি একই দিকে ক্রিয়া করায় মাটির উপর রোলার কর্তৃক প্রযুক্ত নিম্নাভিমুখী বলের পরিমাণ রোলারের ওজন অপেক্ষা বেশি হয়। এই বলের মান ($W+V$)-এর সমান, এখানে W = রোলারের ওজন এবং V = প্রযুক্ত বল P-এর উল্লম্ব উপাংশ কাজেই এক্ষেত্রে মাটির লম্ব প্রতিক্রিয়ার মান, $R=(W+V)$। ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মান μ হলে রোলারকে ঠেলে দিয়ে যাবার সময় ক্রিয়াশীল ঘর্ষণ-জনিত বিরুদ্ধ বল, $F_1=\mu(W+V)$ ..... (i)

রোলার টানবার সময় আমরা যে বল প্রয়োগ করি, তার উল্লম্ব উপাংশ ঊর্ধ্বমুখী অর্থাৎ, এটি রোলারের ওজনের বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে (চিত্র খ)। সুতরাং মাটির ওপর রোলার কর্তৃক প্রযুক্ত বলের মান পূর্বাপেক্ষা কম হয়। এক্ষেত্রে, রোলার কর্তৃক মাটির ওপর প্রযুক্ত বল এবং মাটির লম্ব প্রতিক্রিয়া $(W-V)$-এর সমান। সুতরাং, রোলারকে টেনে নিয়ে যাবার সময় রোলারের গতির বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল ঘর্ষণ-জনিত বল, $F_2=\mu(W-V)$ ...(ii) সমীকরণ (i) নং এবং (ii) হতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, $F_2<F_1$ অর্থাৎ রোলারকে ঠেলে নিয়ে যেতে যে ঘর্ষণ-জনিত বাধা অতিক্রম করতে হয় রোলারকে টেনে নিয়ে যেতে তদপেক্ষা কম বাধা অতিক্রম করতে হয়। এইজন্যই রোলার ঠেলা অপেক্ষা টানা সহজতর। ব্যাপারটা জানার পর সোজা বাড়ি এসে ভাইকে তার প্রশ্নের উত্তর দিই, সে বেশ খুশি হয়। তার খুশির ধারাকে আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দিই শিক্ষক মশায়ের দেওয়া বাহবা ফিরিয়ে দিয়ে এবং আমারটা ওর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে।

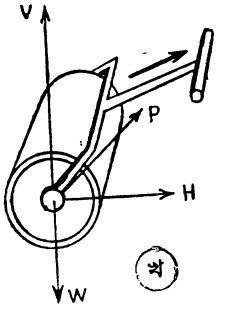

কোলা ইউনিয়ন হাইস্কুল, মেদিনীপুর।

দক্ষ স্থপতি বাবুই

অজয় হোম

সংস্কৃত সাহিত্যে পাখিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থপতির সম্মান বাবুইয়ের। বাবুই তালপাতা ও ঐ জাতীয় অন্যান্য গাছের পাতা সংগ্রহ করে বোনার জন্যে বিখ্যাত। বুনন শিল্পী বাবুইয়ের মতো পারদর্শিতা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

বাবুইয়ের বাসা দেখতে অনেকটা বকযন্ত্রের মতো, প্রবেশমুখ নলাকার। ভিতরটা গম্বুজের মতো, তাতে ভিজে কাদার প্রলেপ। বাসা এমনভাবে প্রস্তুত যে একদম জলঢোকার কোনো সুবিধেই নেই। এমনকি প্রবল ঝড়েও বাসাকে স্থানচ্যুত করতে পারে না।

বাবুই সাধারণত জঙ্গলে বাস করে। মৌসুমীর আগেই এরা জঙ্গলের বাইরে এসে উন্মুক্ত স্থানে বসবাস করতে শুরু করে। এখানেই এরা জোয়ার-ভূট্টার পাতা এবং অন্যান্য নলখাগড়ার পাতা সংগ্রহ করে বাসা বোনা শুরু করে।

স্ত্রী ও পুরুষ পাখি প্রজননকালীন সময় ছাড়া একই রকম দেখতে। এদের মোটা ছোটো চঞ্চু ছাড়া প্রায় স্ত্রী-চড়াইয়ের মতই দেখতে। প্রজনন ঋতু অর্থাৎ বর্ষার আরম্ভেই পুরুষ বাবুইয়ের দেহ উজ্জ্বল হলুদ ও মাথা কালো হয়।

বাবুইয়ের খুব অত্যাশ্চর্য প্রজননকালীন আচরণ। যখনই ঘাস গজাতে শুরু করে পুরুষ বাবুই সেই সময়ে দলবদ্ধ হয়ে জায়গা বাছে যেখানে শত্রুপক্ষের কেউ আসতে পারবে না। সাধারণত বাছে কাঁটাভরা ঝোপঝাড়ের উপরের গাছ, কিংবা জলের উপর বা মাঠের উপর ঝুলে থাকা গাছ। এদের এই কলোনি বাসা দেখা যায় পাঁচ থেকে কুড়ি বা তারচেয়েও বেশি সংখ্যায়। সবই নির্ভর করে প্রয়োজন মতো জায়গার উপর।

পুরুষ বাসার স্থপতি শুরু করে। যখন এই বাসা প্রায় শেষ স্ত্রী-পাখি তখন ঐ কলোনিতে আসে এবং একের পর এক বাসা পরিদর্শন করে। যদি সে কোনোটা পছন্দ করে তখন সেই বাসা পুরুষ বাকিটা শেষ করে।

স্ত্রী-পাখি তিন থেকে চারটি সাদা ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার পর স্ত্রী-পাখিই বাচ্চাদের জন্য পোকামাকড় ও শস্যকণা সংগ্রহ করে।

বাবুইরা স্ফূর্তিবাজ এবং বকবকে পাখি। সাধারণত কথাবার্তা চালায় 'চিট চিট চিট' প্রায় চড়াইয়ের মতো। প্রজননকালে পুরুষ ডাকে লম্বা টানের কিছুটা মিষ্টি সুরে। 'চিইই-ইট'।

চিড়িয়াখানায় সার্কাসে-বাড়িতে

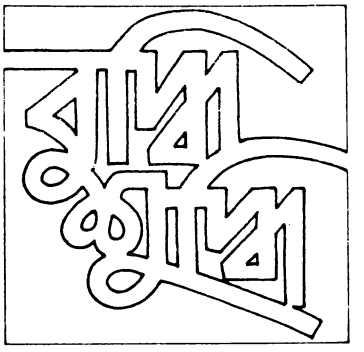

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

চিড়িয়াখানায় জন্তু-জানোয়ার দেখতে যায় সবাই। তোমরাও চিড়িয়াখানা দেখেছ নিশ্চয়ই। জন্তু জানোয়ার দেখার ব্যাপার এক এক জনের কাছে এক এক রকম। কেউ দেখে হিংস্র প্রাণী কি কি আছে। কেউ দেখে তাদের গায়ের রঙ। কার গায়ে লোম আছে, কার কটা শিং। কটা ঠ্যাং, কি কি খায়, গলার আওয়াজ কেমন। কেউ দেখে কোন জন্তুর কেমন আচরণ। কেউ বা খুলো কতরকমের প্রাণী দেখেছে তাই। কেউ আবার আকার আর চেহারা দেখলো। দেখলো কে সবচেয়ে ক্ষুদ্র কে সবচেয়ে বিশাল। কার গায়ে জোর বেশি, কে কত নিরীহ। আসলে প্রাণী পর্যবেক্ষণ করার প্রকৃত জায়গা চিড়িয়াখানা।

সার্কাসেও জন্তু জানোয়ার দেখেছ তোমরা। সে আবার অন্য দেখা। সেখানে জন্তু জানোয়ার তাদের নিজস্ব স্বভাব ভুলে মানুষের শেখানো আদব কায়দা কতটা আয়ত্তে এনেছে তারই পরীক্ষা। যাই হোক, তোমরা সব জন্তু জানোয়ার খুটিয়ে দেখেছ সেটা আমি বিশ্বাস করি। এবারে চটপট নিচের ধাঁধাগুলোর সমাধান করে ফেল। চিড়িয়াখানা আর সার্কাস নিয়ে এবারের ধাঁধা।

(1) চিড়িয়াখানায় যত হাতী আর ময়ূর আছে তাদের সব মিলিয়ে 30টা চোখ আর 44টা পা। কটা হাতী আর ময়ূর আছে চিড়িয়াখানায় ?

(2) সার্কাসে যত ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ার আছে তাদের আছে 50টা পা আর 18টা মাথা। কত ঘোড়া আর সওয়ার আছে ঐ সার্কাসে ?

(3) এক ভদ্রলোকের বাড়িতেও কিছু পোষা প্রাণী আছে। তাদের সব মিলিয়ে 11টা মাথা 20টা পা। দু পাওয়ালার দ্বিগুণ চার পাওয়ালা প্রাণী। কি কি প্রাণী কটা করে আছে ?

বুদ্ধিশুদ্ধি : সেলুন-এর উত্তর

আগেই বলা হয়েছে ঐ অঞ্চলে মাত্র দুজনই চুলকাটার লোক। ঝকঝকে দোকানের মালিকের পরিপাটি করে কাটা চুল ত আর সে নিজে কাটেনি। সুতরাং দোকান নোংরা হলেও সেখানে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

বিজ্ঞানের খবর

বজ্রগোলক থেকে শক্তি

বল-লাইটনিং জিনিসটা কি? বজ্রপাত আমরা জানি, যেখানে মেঘ আর মাটির মধ্যে এক লহমায় প্রচণ্ড পরিমাণ বিদ্যুতের আদানপ্রদান ঘটে। 'বল-লাইটনিং' বজ্রপাত সংক্রান্ত একটি ঘটনা হলেও আকারে প্রকারে আলাদা। কখনো কখনো বজ্রপাতের সময় একটা উজ্জ্বল গোলকের মত বস্তুকে নেমে আসতে দেখা যায় মাটিতে। অত্যন্ত দ্রুত বেগে সেটা ঘুরছে। তার সামনে যা পড়ে, তাকেই সে জ্বালিয়ে দেয়, বা ছিটকে ফেলে দেয়। অনবরত একটা হিসহিসে আওয়াজ তুলে কিছু সময় পরে মিলিয়ে যায় এই বজ্রগোলক। কখনো বা আচমকা একটা বিস্ফোরণের মত শব্দ করেও মিলিয়ে যায়। বজ্রগোলক-রহস্যের নিশ্চিত সমাধান এখনও মেলেনি। কিন্তু সম্প্রতি হল্যাণ্ডের এক বিজ্ঞানী এর সঙ্গে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। পারমাণবিক সংযোগ থেকে শক্তি উৎপাদনের জন্য গোটা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এখন হন্যে হয়ে খাটছেন। এই বিজ্ঞানীটির মতে, খুব কম খরচে, অনায়াসে বজ্রগোলকের মধ্যে পারমাণবিক সংযোগ ঘটানো যাবে। এর কথা অনুযায়ী অজস্র তড়িতাহিত কণা অত্যন্ত দ্রুতবেগে ঘুরতে থাকা অবস্থায় সৃষ্টি করে এক-একটা বজ্রগোলক। এখন যদি কিছু পারমাণবিক কণা, যেমন ডিউটেরনকে এই বজ্রগোলকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তবে, তারা সংযোজন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারবে। এই বিজ্ঞানী ইতিমধ্যেই কৃত্রিম উপায়ে কিছু বজ্রগোলক তৈরি করে ফেলেছেন। কিন্তু যে কাজ এখনো বাকি আছে, তা হল এই বজ্রগোলককে একটা তড়িৎচুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে বন্দী করা। তারপর তাতে প্রয়োজনীয় পারমাণবিক কণা ঢোকানো। বজ্রগোলককে এক জায়গায় আবদ্ধ করে স্থায়ী না করতে পারেন, বলাই বাহুল্য, কোনো প্রচেষ্টাই সফল হবে না।

ভেড়া প্রতি দশ মাইল

নিউজিল্যাণ্ডে নাকি যতজন মানুষ আছে তার থেকে তেইশ গুণ বেশি আছে ভেড়া! অবশ্য, ভেড়াকে অবজ্ঞা করার কিছু নেই। তাছাড়া, নিউজিল্যাণ্ডবাসীরা যেখানে ইদানীং ভেড়াকে বেশ সম্ভ্রমের চোখেই দেখতে শুরু করেছেন। ভেড়া এখন জ্বালানি তেলের বিকল্প। আদিকাল থেকেই ভেড়া তার লোম আর মাংস দিয়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করে আসছিল। এখন সে মানুষের ডিজেলচালিত গাড়িগুলোকেও সন্তুষ্ট করবে তার চর্বি থেকে তৈরি তেল দিয়ে। এই নতুন জ্বালানি তেলে ভেড়া-পিছু দশ মাইল দৌড়াচ্ছে! ডিজেল চালিত বাস বা ট্রাক। ভেড়ার মাংস কাটতে গিয়ে অতিরিক্ত যে চর্বির ভর পাওয়া যায় তাকে প্রথমে আর্দ্রবিশ্লেষণ করা হয়। এ থেকে কিছু ফ্যাটি অ্যাসিড যেমন পাওয়া যায়। তেমনি পাওয়া যায় গ্লিসারল—ওষুধ থেকে শুরু করে বারুদ

উল্কা-রহস্য

ডাইনোসররা দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করতে করতে সাড়ে ছ কোটি বছর আগে কেন হঠাৎ সদলবলে মারা গিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেল? অনেকের মতে, একটা অতিকায় উল্কাপিণ্ড সেই সময়ে আছড়ে পড়েছিল পৃথিবীর বুকে। সেই সংঘর্ষের তেজে কয়েক মাইল জুড়ে প্রচণ্ড উত্তাপে মাটি গলে গিয়েছিল। সৃষ্টি করেছিল একটি গহ্বর। ধুলো আর মাটি ছিটকে উঠেছিল সুদূর মহাকাশ অবধি। সেই ছিটকে ওঠা ধুলোতেই শেষ পর্যন্ত সমস্ত আকাশ ঢেকে গিয়ে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে পড়েছিল। সূর্যের আলোর অভাবে উদ্ভিদকুল যেমন বিনষ্ট হতে শুরু করল, তেমনি মারা পড়তে থাকল তাদের উপর নির্ভর করে থাকা বহুপ্রাণী। ডাইনোসররাও ছিল তাদের মধ্যে। মাটি খুঁড়ে ডাইনোসরের জীবাশ্ম পাওয়া গেলেও, যা এখনো পর্যন্ত অমিল, তাহল সেই অতিকায় উল্কার চিহ্ন। চিহ্ন বলতে বিজ্ঞানীরা সেই কয়েক মাইল ব্যাপী গহ্বরটারই অবশিষ্টাংশ আশা করছেন। মাটিতে এই ধরনের উল্কাপাত হলে তার চিহ্নের অনেকটাই ক্ষয়ে ক্ষয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় রোদ, বৃষ্টি, বাতাসের সম্মিলিত আক্রমণে। কিন্তু যেখানে আমাদের এই গ্রহটার তিন-চতুর্থাংশই জলে ঢাকা, সেখানে এই উল্কা জলের মধ্যে পড়ার সম্ভাবনাও কম নয়। মহাসাগরের তলায় চিহ্ন খুঁজতে যাবে কে? তবে, সম্প্রতি কানাডার এক বিজ্ঞানী ওই দেশের পূর্ব উপকূলের কাছে, 350 ফুট জলের তলায় সত্যিই একটা গহ্বর খুঁজে পেয়েছেন। সমুদ্রের তলদেশ এমনিতেই পাহাড় নালা গহ্বরে ভরা। কিন্তু এই গহ্বরটির জমিতে আছে হঠাৎ গলে গিয়ে আবার কঠিন হয়ে যাওয়া পাথর, ঠিক যেমনটি উল্কাপাতের সময় হওয়া সম্ভব। মাটির নীচে তেলের সন্ধান করতে করতে এই গহ্বরটি খুঁজে পায় এক তেল কোম্পানি। তবে, ডাইনোসরের মৃত্যুর সাক্ষী এই গহ্বরটা নয়। এটির বয়স অনেক কম, পাঁচ কোটি বছর। জলের তলায় পাওয়া এই উল্কার চিহ্ন ডাইনোসর রহস্যের না হলেও, উল্কা-রহস্যের অনেক সমাধান ঘটাবে।

—যুধাজিৎ দাশগুপ্ত

কীট পতঙ্গের কথা

প্রলয় ঘোষাল

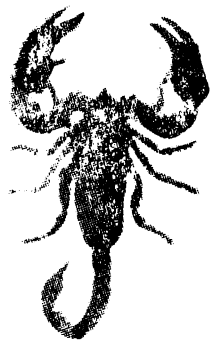

কাঁকড়া বিছে

কাঁকড়া বিছে, ইংরাজী নাম স্করপিওন (Scorpion) বৈজ্ঞানিক নাম ইয়াসকরপিওস কারপাথিকাস (Euscorpius Carpathicus) নামটা শুনলেই একটা ভয় আমাদের পেয়ে বসে। কাঁকড়া বিছে, সাংঘাতিক সত্যিই সাংঘাতিক। দেখতেও ভয়ংকর। বিশাল বিশাল দাঁড়া নিয়ে চেহারাটা সত্যিই ভীতি সঞ্চার করে।

কাঁকড়া বিছের ভয়ংকর আকৃতির দাঁড়াগুলো দেখতে ভয়ংকর হলেও এদের বিষ থাকে লেজের শেষ প্রান্তে শক্ত ছুঁচলো অংশের ঠিক নিচে। গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের বিশেষ কয়েক জাতের কাঁকড়া বিছের প্রচণ্ড বিষ থাকলেও, কারপাথিয়ান নামের বা ঐ জাতীয় বিছের বিষ একদমই মারাত্মক নয়। মানুষের বাসস্থানের খুব কাছাকাছি থাকার জন্যই সাপের থেকে এদের কামড়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়।

এদের বিষ এত মারাত্মক হলেও, বিশেষ অবস্থা ছাড়া বিষের ব্যবহার করে না এরা। খাদ্য ধরবার জন্য দুটো বড় দাঁড়া ব্যবহার করে। শুধু মাত্র যখন শত্রুরা এদের থেকে আকৃতি এবং শক্তিতে বড় হয় তখনই বাঁচবার জন্য বিষের ব্যবহার করে এরা।

সূর্য মাকড়সা

ওপরের ছবিটা দেখে কি মনে হয়? কিরকম রোঁয়া-ভর্তি শরীর। দুটো বড় দাঁড়া! চেহারাটা দেখলে ভয় করে! আবার চলা ফেরা করার সময় একদম শব্দ হয় না, সামান্যতমও না। এদের নাম সূর্য মাকড়সা (sun-spider)। বৈজ্ঞানিক নাম সলপুগা লেটালিস (solpuga letalis)। লেটালিস এর অর্থ প্রাণঘাতী। কিন্তু এরা মোটেই প্রাণঘাতী নয়, এতটুকুও বিষাক্ত নয়, কিন্তু এরা এদের ধারালো দাড়া দিয়ে শত্রুর রক্ত পর্যন্ত বের করে দিতে পারে।

সূর্য-মাকড়সা নাম। কিন্তু এদের প্রজাতির কয়েকটি রাত্রে বের হয়। রাত্রেই খাবারের সন্ধানে ঘোরাফেরা করে। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে এদের আকৃতির তারতম্যও আছে বেশ। কোন কোনটা লম্বায় 8 মিমি আবার কোন কোনটা 6 সেমির মত হয়। আকৃতি অনুযায়ী এদের খাবারের বৈচিত্র্যও রকমারি। সবচেয়ে বড় আকারের সূর্য-মাকড়সা কোন কোন সময় এক একটা গিরগিটিও মেরে ফেলতে পারে খাওয়ার জন্য।

ইলেকট্রনিক্স—ক্যুইজ Part XIII বিপ্লব ব্যানার্জী

1. দিনের বেলা অপেক্ষা বেশী রাত্রির দিকে Short Wave Radio Station গুলি অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি পরিষ্কার ও জোরে শোনা যায় কারণ বেশী রাত্রির দিকে,—

ক) Ionosphere এর সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে তাই কোন বাধা থাকে না।

খ) বেশি রাত্রির দিকে Short Wave Radio তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠের প্রায় হাতখানেক দূরত্বের মধ্যে চলে আসে বলে উক্ত তরঙ্গ দিনের বেলা অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী অবস্থায় বিদ্যামান থাকে তাই Station ধরা অনেকটা সহজসাধ্য হয় এবং Station ও খুব জোরে বাজে।

গ) বেশি রাত্রির দিকে Ionosphere এর খানিকটা নীচে নেমে আসে এবং সেই সময়ে Ionosphere এর উপরে ও নীচে ওঠানামার হার অপেক্ষাকৃত অনেক কম, ফলে রেডিও ওয়েভকে অনেকটা কমপথ অতিক্রম করে Radio Receiver এর Antenna Section এ আসতে হয়।

2. আনুমানিক 4·7 micro henry inductance বিশিষ্ট এবং 0·1 ohm রোধযুক্ত একটি Inductor coil 1 Megaherze কম্পাঙ্কে কাজ করিলে উক্ত Inductor coil টির Quality Factor হইবে প্রায় –

ক) 100, খ) 200, গ) 300

3. একটি Series Circuit এর Resistor এবং Capacitor এর মান যথাক্রমে One Mega ohm এবং One Micro Farad হইলে উক্ত Series circuit টির Time constant হইবে,—

ক) 1 সেকেণ্ড, খ) 0·1 সেকেণ্ড, গ) 10 সেকেণ্ড, ঘ) 100 সেকেণ্ড

4. ভ্যাকুয়াম টিউব বাল্বের voltage Amplification =—

5. Percentage of modulation = —

6. একটি নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণকে বলা হয়—

7. Infra-Red Light যে কম্পাঙ্কের তরঙ্গ বিকিরণ করে তার শুরু ও শেষ কোথায় ?

8. X-ray কম্পাঙ্কের শুরু ও শেষ কোথায় ?

9. তুমি একটি LED কে জ্বালাইতে চাও উহার মধ্য দিয়ে 24 mA current পাঠাইয়া একটি Capacitor এর সাহায্যে 240 volt, 50 Hz A.C Mains Power Supply হইতে। সুতরাং এক্ষেত্রে Capacitor টির value হওয়া উচিৎ কমপক্ষে,—

ক) 0·1μF/600v =, খ) 0·22μF/600v =,

গ) 0 33μF/600v =, ঘ) 0 47μF/600v =

10. Superterodyne Transistor Radio Receiver Set এ যে ধরনের oscillator সাধারণতঃ ব্যবহার কারা হয় তাহা হইল,—

ক) Reinartz, খ) Collpit, গ) Heartley, ঘ) weinbridge, ঙ) Butterfly

11. কোন রকম Active বা passive device ব্যবহার না করিয়া তুমি কতকগুলি LED কে 240V, 50 Hz A·C Mains Power supply হইতে সোজাসুজি জ্বালাইতে চাহিলে তোমার কি করণীয় আছে !

ইলেকট্রনিক্স ক্যুইজ Part XIII এর উত্তর

1. (গ), 2. (গ), 3. (ক), 4. $\frac{\text{Amplification Factor} \times \text{Load Resistance}}{\text{Plate Resistance} + \text{Load Resistance}}$

5. $\left(\frac{\text{Emax} - \text{Emin}}{\text{Emax} + \text{Emin}}\right) \times 100$ 6. Monochromatic, 7. পনেরো হাজার গিগাহার্জ হইতে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার গিগাহার্জ 8. 30 Peta Hertz হইতে 30 Exa Hertz 9. (গ), 10. (ক), 11. 100 টি LED পর পর Series এ সংযুক্ত করিয়া উক্ত Series circuit টির across এ উক্ত 240v, 50 Hz Mains Power Supplly প্রয়োগ করিয়া যেখানে প্রত্যেকটি LED কে 2·4 volt বিভব প্রভেদে জ্বালানো হইতেছে।

লেখকের নিবেদন

দু বছর আগে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পাতায় শুরু করেছিলাম ইলেকট্রনিক্সের গোড়ার কথা দিয়ে। শেষ করছি ইলেকট্রনিক্স ক্যুইজ দিয়ে।

ইলেকট্রনিক্সের কলাকৌশল বিভাগে Basic Electonics সম্বন্ধে যৎসামান্য কিছু বলার চেষ্টা করেছি করেছি 5টি অধ্যায়ে। এ ছাড়া পরপর দুটো পূজোসংখ্যায় দুটো ভাল ইলেকট্রনিক্স মডেল সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। সে লেখাও তোমাদের কতখানি টানতে পেরেছে সেটাও আমার জানা বাকী আছে।

আমার লেখাগুলি সম্পর্কে এবং ভবিষ্যতে তোমরা কি ধরনের লেখা পড়তে চাও সে বিষয়ে সম্পাদকীর দপ্তরে মতামত জনাতে ভুলো না কিন্তু ! আজ এপর্যন্তই। সকলকে আমার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা জানাই।

17, নং-যাদব ঘোষ রোড, সরশুনা, কলিকাতা-61

বিজ্ঞানীর টুকিটাকি

পরমাণুবাদের জনক ডিমাক্রিটাস

গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাসকে পরমাণুবাদের জনক আখ্যা দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষ তখন অতি-প্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। আর ডিমোক্রিটাস সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করতে সচেষ্ট ছিলেন।

একদা এক টাক-মাথা ভদ্রলোক রাস্তায় এক দুর্ঘটনায় পড়েন। একটি কচ্ছপ তাঁর মাথার উপরে পড়ে আর সেই আঘাতেই ভদ্রলোক মারা যান। সে সময়ে যে সব লোক দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল তারা বললো, 'আমরা একটা ঈগল পাখিকে মৃতদেহের উপরে আকাশে উড়তে দেখেছি। তখনকার দিনে জনসাধারণ বিশ্বাস করতো যে ঈগল হচ্ছে দেবতা ZEUS-এর পাখি। এতএব তারা ভাবলো যে, এই দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণ ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবেই ঘটেছে।

এ গুজব বা কাহিনী যখন ডিমোক্রিটাসের কাছে পৌঁছুলো তখন তিনি ঘটনাস্থলে গেলেন এবং উপস্থিত জনসাধারণকে বলতে লাগলেন, 'ঈগল পাখি কচ্ছপের মাংস খেতে ভালবাসে কিন্তু কখনও কখনও কচ্ছপের খোলস থেকে মাংস বের করে নিতে তার কষ্ট হয়। কাজেই কচ্ছপ ঈগল পাখিকে ঠোঁটে কামড়ে ধরে আকাশে অনেক উঁচুতে উঠে যায়। তারপর উড়তে উড়তে যেখানে বেশ চকচকে পাহাড় দেখতে পায়, সেখানে কচ্ছপটিকে ফেলে দেয়। পাহাড়ের শিলার উপর পড়ে কচ্ছপের খোলাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তখন ঈগল পাখির পক্ষে মাংস খাওয়া সহজতর হয়।

এক্ষেত্রে কি হয়েছিল, জ্ঞান?

—ঈগল পাখি দুর্ঘটনা কবলিত মানুষটির মাথার চকচকে টাককে পাহাড় ভেবে তারই উপর কচ্ছপটিকে ফেলে দিয়েছিল। আর তারই আঘাতে ভদ্রলোকের মৃত্যু ঘটেছে।

স্যার ফ্রান্সিস বেকন

'স্যার ফ্রান্সিস বেকন' ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও লেখক। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান চর্চায় তিনি ছিলেন অগাধ বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন।

শেষ বয়সে স্যার ফ্রান্সিস বেকন একদিন বরফের উপর দিয়ে তাঁর গাড়ি চালিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে হঠাৎ তাঁর মনে হলো যে প্রাণিদেহের কোষকে বরফাচ্ছন্ন করে রাখলে হয়তো জীবন্ত কোষগুলি দীর্ঘকাল পচনের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।

—মাথায় এ চিন্তা আসা মাত্রই তিনি গাড়ি নিয়ে ছুটলেন গ্রামের পানে। সেখানে এক কৃষকের ঘর থেকে একটি মোরগছানা কিনে নিয়ে এলেন। তারপর বরফের মধ্যে জ্যান্ত মোরগছানাটিকে কবর দিলেন। উদ্দেশ্য তাঁর ধারণা সত্যি কিনা তা পরখ করে দেখা।

কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটলো। বরফ নিয়ে অনেকক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করার ফলে তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সে ব্রংকাইটিশ রোগে আক্রান্ত হলেন। আর সেই রোগেই তাঁর মৃত্যু ঘটলো।

—অমরনাথ রায়

এক বিশিষ্ট রাষ্ট্রের রানীর আমন্ত্রণে চলেছেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন। রানী তাকে অতিথি হিসাবে পাবে তাই খুশি। রাজসভায় আনন্দের ধূমধাম আইনস্টাইন আসছেন জেনে। রানী কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তিকে পাঠালেন মহামর্যাদায় গাড়ীতে করে আইস্টাইন কে আনার জন্য। সময় পেরিয়ে যায় তবু আইনস্টাইন আসেন না, চিন্তিত রাণী, সবাই ভাবছেন কেন আসছেন না। সারা স্টেশন খুঁজেও তেমন কোন ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন না।

এমন সময় বগলে একটা টিনের সুটকেস, অন্য বগলে একটা বেহালা নিয়ে অতি সাধারণ পোষাকে আস্তে আস্তে এসে দারোয়ান কে বললেন, আমি রাণীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। কে কার কথায় কান দেয়। "এই লোকটা নাকি রানীর সাথে দেখা করবে"—অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ছাড়া না পেয়ে তিনি বললেন, রানী কে গিয়ে বলো আইনস্টাইন এসেছে।

খবর পেয়ে রানী ছুটে এসে বললেন কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আমি তো আপনার জন্য গাড়ী পাঠিয়েছিলাম, তারা চিনতে পারে নি আপনাকে। আমার জন্যে গাড়ী পাঠাবে এ আমি ভাবতেই পারিনি। অত্যন্ত সহজ ভাবে বললেন মহামান্য আইন্টাইন।

—মানসকুমার চিনি

গণিতের উৎপত্তি

সমীরকুমার ঘোষ

স্কুলের সাধারণ কোন ছাত্রকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তার কোন বিষয়টি সবচেয়ে শক্ত লাগে, তবে অবশ্যই সে উত্তর দেবে যে 'অঙ্ক'। সত্যিই, অঙ্কের মত কঠিন বিষয় বোধ হয় অধিকাংশ ছাত্রদের কাছে আর কিছুই লাগে না। তবে অনেকে আছেন, যাঁদের কাছে কিন্তু অঙ্ক খারাপ ত' লাগেই না, বরং অঙ্কে তাঁরা ভীষণ আনন্দ পান। সভ্য মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের যতগুলি বিভাগ প্রচলিত রয়েছে, বলতে গেলে, অঙ্ক বা গণিতই হ'ল তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। কারণ প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষকে অঙ্কের বিভিন্ন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে হয়েছিল।

আদিম যুগে বন্য মানুষ যখন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করেছিল, তখনই নিজের গোষ্ঠীর লোকেদের হিসাব রাখা বা শিকার করা জিনিষের মাপার জন্যই সুরু হয়েছিল অঙ্ক কষা। এসব অবশ্য বহু পুরানো যুগের কথা। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের যত রকম শাখা রয়েছে; তার মধ্যে প্রধান হ'ল গণিত। বস্তুতঃ, গণিত ছাড়া আজ সকল বিজ্ঞানই প্রায় অচল, অথচ গণিতচর্চা মোটেই ব্যয়বহুল নয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় গবেষণা করতে হলে প্রয়োজন হয় পরীক্ষাগারের, প্রয়োজন হয় যন্ত্রাদির, কিন্তু গণিতচর্চার জন্য প্রয়োজন হয় সামান্য কিছু কাগজ, একটি কলম—আর বলাই বাহুল্য যে—অবশ্যই মস্তিষ্কের উর্বরতা। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তাঁর পরীক্ষাগার বা গবেষণার সাজ সরঞ্জামই বা কোথায়। উত্তরে মহামনীষা তাঁর নিজের মাথায় আঙ্গুল দিয়ে বলেছিলেন যে, 'এই আমার বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম'।

গণিত কথাটার অর্থ কি? গণনা থেকেই গণিত। যে বিশেষ জ্ঞানের সাহায্যে গণনা করা যায় তাকেই বলে গণনাবিজ্ঞান। এই গণনাবিজ্ঞান থেকেই উৎপত্তি হ'য়েছে 'গণিত' শব্দটি। আমাদের প্রাচীনতম শাস্ত্র বেদেও এই 'গণিত'-এর উল্লেখ আছে। বেদের মধ্যে বলা হয়েছে যে, 'সাপের মাথায় যেমন মণি, আর ময়ূরের মাথায় যেমন শিখা, তেমনি শাস্ত্রের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ হ'ল গণিত'। সুতরাং গণিতের উৎপত্তিকাল যে কত প্রাচীন, তা এর থেকেই বোঝা যায়।

প্রাচীন কালে গণিতের শ্রেণীবিভাগ নানা ধরণের থাকলেও; আধুনিক যুগে গণিত শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। গণিত বলতে আজ আমরা পাটীগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি ইত্যাদি সব শাখাই বুঝি। কিন্তু গণিতের এইসব শাখার এধরনের নামকরণ হ'ল কিভাবে? আসলে, যে শাখাই হোক্ না কেন, না লিখে কোন গণনার কাজ করা কখনোই সম্ভব নয়, আর লিখতে গেলে প্রয়োজন হয় দুটি জিনিষের। এক, যা দিয়ে লেখা হবে আর দুই, যার ওপর লেখা হবে। যার ওপর লেখা হবে সে জিনিষ হিসাবে 'পাটী' ব্যবহারের প্রচলন বহুকাল আগেই ছিল। আর এ থেকেই, যে গণনাকাজ পাটীর ওপর করা হত, সেই গণনা-কাজকেই নাম দেওয়া হয়েছিল "পাটীগণিত"। আধুনিক যুগে পাটীতে লেখার প্রথা উঠে গেলেও, পাটীগণিত নামটি রয়ে গেছে, বস্তুতঃ, পাটীগণিতে কতকগুলি সংখ্যা ব্যবহার করার রীতিই বিশেষভাবে প্রচলিত। কিন্তু বীজগণিতে কতকগুলি অজানা সংখ্যা বা 'বীজ' ব্যবহার করা হয় বলেই, এই শাখাটির এরকম নাম। এই বীজ সাধারণতঃ কোনো প্রতীক (x) দিয়ে বোঝানো হ'য়ে থাকে। প্রাচীন ভারতের বিশিষ্ট গণিতজ্ঞেরা, যেমন ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর আচার্য প্রভৃতিরা এই পাটীগণিত ও বীজগণিতের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করেন।

গণিতশাস্ত্রের ইংরাজী নাম Mathematics. গ্রীক শব্দ 'ম্যাথিন' থেকে এই শব্দটি এসেছে যার অর্থ শিক্ষা করা। ঠিক একই ভাবে গ্রীক শব্দ 'অ্যা'রথোমাসা' (সংখ্যা) থেকে এসেছে 'আরিথমেটিক' বা পাটীগণিত এবং "জিও" (পৃথিবী) ও "মেট্রি" (পরিমাপ) থেকে 'জিওমেট্রি' বা জ্যামিতি। ত্রিভুজের তিনটি কোণ বা 'ট্র্যাঙ্গল' থেকে এসেছে ত্রিকোণমিতি। সুতরাং গণিত শাস্ত্রের প্রচলন যে দেশেই প্রথম হয়ে থাকুক না কেন, দুইটি মূল ধারণার ওপর নির্ভর করেই গণিতের সৃষ্টি হয়েছিল। এক, গণনাকার্য এবং দুই, পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে প্রাচীন লোকেদের ধারণা।

এই হ'ল গণিতের উৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

মজাদার জ্যামিতি

লক্ষীকান্ত বসু

কিছু কাল আগে কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রকাশিত ইঁদুর ও বাজ পাখির অঙ্কটি সত্যিই মজাদার, সত্যিই গণিত প্রেমীদের আনন্দদেবে। এই প্রসঙ্গে আমি একটি সহজ জ্যামিতির অঙ্কন ও প্রমাণ দিলাম। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পাঠকেরা আনন্দ পেলে, আনন্দ পাব।

॥ একটি বৃত্তের কেন্দ্র নির্ণয় ॥

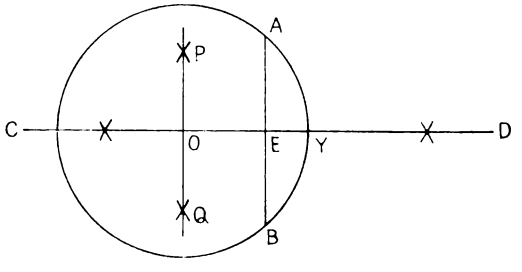

উপরে একটি বৃত্ত অঙ্কন করা আছে। উহার কেন্দ্র নির্ণয় করতে হবে।

অঙ্কন :—AB একটি যে কোন জ্যা অঙ্কন করা হল। AB এর সমদ্বিখণ্ডক DC অঙ্কন করা হল যা বৃত্তটিকে x ও y বিন্দুতে ছেদ করেছে। xy এর সমদ্বিখণ্ডক PQ অঙ্কন করা হল। O বিন্দুটি হবে উক্ত বৃত্তের কেন্দ্র। ও xy ব্যাস।

প্রমাণ :—আমরা জানি কেন্দ্র গামী সরল রেখা ব্যাস নয় এ রূপ যে কোন জ্যা কে সমদ্বিখণ্ডিত করলে উহা জ্যায়ের উপর লম্ব হয় কিংবা লম্ব হলে জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে। কিন্তু এখানে AB জ্যা সমদ্বিখণ্ডক হল oy।

অর্থাৎ $OE \perp AB$ ও $AE = EB$, তাই বলা যায় OE কেন্দ্রগামী সরল রেখা,

$\therefore$ XY ,কেন্দ্রগামী সরল রেখা যা বৃত্তকে দুটি পৃথক বিন্দুতে স্পর্শে করেছে।

$\therefore$ XY বৃত্তটি র ব্যাস।

$\therefore$ OX বৃত্তটির ব্যাসার্ধ [$\because$ $XO = OY$]

$\therefore$ O বৃত্তটির কেন্দ্র। [প্রমাণিত]।

গোবরা, চণ্ডিতলা, হুগলী।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মাবলী

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য 5·00 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র (April-March) গ্রাহক চাঁদা 50·00 টাকা। হাতে বই নিলে গ্রাহক চাঁদা 40·00 টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- Under Certificate of Posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত 30·00 টাকা পাঠাতে হবে।
- M O বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।
- 25 কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা 25 টাকা।
- ভি. পি. পি বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হয়। সংখ্যাপিছু গ্রাহকদের 1·00 টাকা করে সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখতে হবে।

লেখকদের প্রতি

- বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী যে কোন বিজ্ঞানরচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশের জন্য পাঠানো যেতে পারে।
- পাতার একদিকে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রতিটি রচনার সঙ্গেই ছবি পাঠাতে হবে।
- প্রেরিত রচনা সাধারণতঃ এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে অনুমোদিত হয়নি বলে ধরে নিতে হবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না।

বরলী রেক্টরি কি হানাবাড়ি

কাজল ভট্টাচার্য

হানাবাড়ি! শব্দটা শুনলেই গা ছমছম করে ওঠে। পরিত্যাক্ত যে বাড়িতে অশুভ শক্তি ডেরা বাঁধে, সেখানে চলতে থাকে সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা—জনশূন্য বাড়িতে জ্বলে ওঠে আলো, অলিন্দে ধাক্কা খেয়ে ফেরে ভবঘুরে বাতাস, ভরদুপুরে সে-বাড়ির চিলেকোঠাতে বসে দাঁড়কাক বিষণ্ণ স্বরে ডাকে, মানুষের মুখোমুখি হয়ে পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে যায় খোলাচুল তরুণীর প্রেতাত্মাটি।

হানাবাড়ির ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করতে বসে যে-বাড়িটিকে এড়িয়ে সেকাজ সম্পূর্ণ করবার উপায় নেই সেটি হল বরলী রেক্টরি। 1863 সালে রেভারেণ্ড হেনরি বুল নামে এক যাজক তৈরি করেছিলেন বাড়িটি। এর অবস্থান হল লণ্ডন থেকে 96 কিলোমিটার দূরে সাফোক এবং এসেক্স কাউণ্টির সীমান্ত মধ্যবর্তী একটি গ্রামে। এর কিছু অংশ অবশ্য এখানে হেনরি বুল-এর আগেই, 14 শ শতাব্দী থেকে ছিল।

বরলীর সব থেকে প্রসিদ্ধ প্রেতটি হল এক অল্পবয়েসী সন্ন্যাসিনীর। রেক্টরির গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। শোনা যায়, 14 শ শতাব্দীতে তাকে এই রেক্টরিতে হত্যা করা হয়েছিল, জীবন্ত সমাধি দিয়ে।

এই সেই বরলী রেক্টরির হানাবাড়ি

এই কাহিনীর কোনো ঐতিহাসিক সমর্থন নেই কিন্তু দীর্ঘ-দিন যাবত চলে আসছে।

বরলী রেক্টরিকে যিনি জনসমক্ষে প্রথম তুলে ধরেন তিনি প্রেততাত্ত্বিক হ্যারি প্রাইস। প্রেতসন্ধান বিষয়টি এই প্রেততাত্ত্বিকের কাছে ছিল জলভাত, হানাবাড়িতে রাত কাটানোর সুযোগ পেলে প্রাইস বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তা গ্রহণ করতেন। প্রাইস কি ছিলেন—সত্যসন্ধানী, না প্রতারক—তা নিয়ে বির্তক রয়েছে। প্রেতবৈধকে নকল মিডিয়ামদের কৌশল তিনি উদ্ঘাটন করেছেন ঠিকই, কিন্তু অনেকেই তাঁকে যথার্থ সত্যসন্ধানী বলে মানতে চান না। বরলীর কাহিনী নিয়ে লেখা প্রাইস এর The Most Haunted House in England বইটি বরলীকে এনে দিয়েছে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ হানাবাড়ির সম্মান!

1929 সালের 11 ই জুন মঙ্গলবার প্রাইস এক বন্ধুর সঙ্গে যখন মধ্যাহ্নভোজে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁর টেলিফোন বেজে উঠল। লণ্ডনের একটি নামী কাগজের সম্পাদক প্রাইসকে শোনালেন বরলী রেক্টরির রহস্যময় ঘটনাবলী। সেখানে সবার আগে প্রাহস খবরের কাগজ থেকে বরলী সম্বন্ধে প্রকাশিত ঘটনা জেনে নিলেন। ফাঁকা মেঝেতে পায়ের দাগ, নিহত সন্ন্যাসিনীর আবির্ভাব নিয়ে সংবাদ কাগজে বেরিয়েছিল। একসন্ধ্যায় ভূতপূর্ব রেক্টর হেনরি বুল বাইরে বেড়ানোর সময় দেখতে পেয়েছিলেন একটি পুরনোধাঁচের গাড়িকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মুণ্ডহীন দুই ব্যক্তি!

বর্তমান রেক্টরের নাম জি. ই. স্মিথ। তাঁরাও পোল্টার-গাইস্টের (উপদ্রবকারী খেলুড়ে-স্বভাবের প্রেতের এই নাম দিয়েছেন প্রেতগবেষকরা) উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। একসন্ধ্যায় মিঃ স্মিথ যখন ল্যাণ্ডিং পার হচ্ছিলেন তখন হঠাৎ শুনতে পেলেন এক মহিলার কণ্ঠস্বর। গলার আওয়াজ নিচু পর্দা থেকে ক্রমশঃ ওপর দিকে বাড়তে-বাড়তে শেষ হল মহিলাকণ্ঠের আর্তনাদ দিয়ে—ডোণ্ট কালোস, ডোণ্ট!' ভৌতিক কথোপকথন ছাড়াও রেভারেণ্ড হেনরি বুল এবং নীল পোশাক পরা একটি তরুণীর প্রেতাত্মাও দেখা দিল। পোশাকের খসখস শব্দ, ঘণ্টাধ্বনি, দরজায় আঘাত, শূন্যে জিনিসপত্র ছোঁড়াছুড়ি ইত্যাদি'ত পাশাপাশি চলছিল।

প্রথমবার প্রাইস বরলীতে এসে রইলেন তিনদিন। তিনি হেনরি বুল-এর আত্মার সঙ্গে! ঘাতধ্বনির মাধ্যমে যোগাযোগ করেছিলেন। একটি আঘাত মানে 'হ্যাঁ' ও দু'টি মানে না, —এই ছিল তাঁর পদ্ধতি। প্রাইস উৎসাহী হয়ে তাঁর গবেষণা চালিয়ে গেলেন কিন্তু এ-বাড়িতে টিকে থাকা অসাধ্য মনে হল স্মিথ পরিবারের কাছে। তাঁরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন 1930 সালে। তাঁদের পরিবর্তে বরলীতে এলেন রেভারেণ্ড এল. এ. ফস্টার।

ফস্টার এলে পরেও কিন্তু বরলীতে প্রেতের উপদ্রব থামল না। অদ্ভুত-অদ্ভুত নানা ঘটনা ঘটেই চলল। ফস্টার-এর কমবয়েসী স্ত্রী ম্যারিয়ানি হলেন প্রেতদের আক্রমণের লক্ষ্য। তাঁকে উদ্দেশ করে রেক্টরির দেওয়ালে বিচিত্র সব লেখা আবির্ভূত হতে আরম্ভ করল। যাজক পরিবারের গাড়িচালক জেমস ব্যালেণ্টাইন একদিন রান্নাঘরে আগুনের পাশে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। হঠাৎ সে দেখতে পায় আধখোলা দরজার কপাট ও ফ্রেমের মাঝখানে একটি কালো রং-এর ভৌতিক হাত। হাতটি ক্রমাগত ওপর-নিচ করছিল। রেভারেণ্ড ফস্টার রেক্টরি পবিত্র করতে গিয়ে পাথরের আঘাতে আহত হলেন এবং সবশেষে তাঁরাও বরলী ছেড়ে চলে গেলেন 1935 সালে।

1937 সালের মে মাসে প্রাইস বরলী রেক্টরি ভাড়া করলেন গবেষণার জন্যে। একবছর পরে তাঁর কাজ সমাপ্ত হলে তিনি রেক্টরি ত্যাগ করে চলে যান এবং বাড়িটি ক্যাপ্টেন গ্রেগসন নামে একব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকে। এ-অবস্থায় 1939 সালের 27 শে ফেব্রুয়ারির রাতে আগুন লেগে বরলী রেক্টরি ধ্বংস হয়ে যায়। বিধ্বংসী সেই আগুনের শিখায় নাকি বিচিত্র-সবমূর্তিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছিল। বরলীর ধ্বংসাবশেষের একটি প্রকোষ্ঠ থেকে অনুসন্ধানের সময় মানুষের দেহাবশেষ পাওয়া গেছিল। একটি চোয়ালের হাড়কে কেউ-কেউ সেই নিহত সন্ন্যাসিনীর বলে দাবি করলেও তা প্রমাণিত হয়নি। এক আলোকচিত্র গ্রাহক এ সময়ে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে। ভস্মীভূত রেক্টরির ছবি তুলেছিল সে, ছবি প্রিণ্ট হতে দেখা যায় একটি ইঁট শূন্যে অবলম্বনহীনভাবে ভাসছে!

The Most Haunted House in England বইয়ের শেষাংশে প্রাইস ভুতুড়ে ঘটনার একটি তালিকা দিয়েছেন যা তাঁর প্রত্যয়কেই দৃঢ় করে যে, বরলী রেক্টরি ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ হানাবাড়ি। সেই তালিকাটি আমরা একবার দেখতে পারি—

বুল পরিবারের ছয় সদস্য, তাঁদের পাচক এবং অন্য সাতজনের সামনে আবির্ভূত হয়েছিল সেই সন্ন্যাসিনী।

মিসেস ফস্টার দেখতে পেয়েছিলেন হেনরি বুলকে!

মুণ্ডহীন একটি মানুষকে দেখেছিলেন হেনরি বুল।

মিসেস বুল এবং আরও দু'জনের সামনে উপস্থিত হয়েছিল নীল পোশাক পরিহিতা এক তরুণীর প্রেতাত্মা।

জনৈকা মিসেস উইলসন দেখতে পেয়েছিলেন একটি অস্বাভাবিক পোকাকে।

হেনরি বুল এবং আরও দু'জন প্রত্যক্ষ করেছিলেন একটি ভৌতিক গাড়িকে।

গ্রামের জনৈক পুলিশ ধূসর পোশাক পরিহিত একটি মূর্তিকে দেখেছিল।

রেক্টরির দেওয়ালে যাজকপত্নী ম্যারিয়ানি কে উদ্দেশ্য করে কিছু লেখা আবির্ভূত হয়েছিল। যেমন, 'ম্যারিয়ানি-নাইট—মাস-প্রেরার্স' এবং ম্যারিয়ানি প্লিজ হেল গেট!'

এ-পর্যন্ত লেখা প্রবন্ধের নামকরণের সঙ্গে যেন ঠিক মিলছে না। শিরোণামের সন্দেহ কিন্তু অন্তর্হিত হয়নি। তবে বরলী-রহস্যের উত্তর পেতে হলে বাড়িটির নয়, বিশ্লেষণ দরকার একে যিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছেন সেই হ্যারি প্রাইসকে।

প্রথমেই বলি, হ্যারি প্রাইস বরলীকে নিয়ে আদৌ কোনোরকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেননি। বৈজ্ঞানিক তদন্তের নামে নিছক ছেলেখেলা হয়েছে। কারণ, প্রাইস নিজে মোটেই বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন না।

প্রাইস মানসিক ক্ষমতাবলে জড়বস্তুর সঞ্চালন (অর্থাৎ সাইকোকাইনেসিস, আজ আমরা সকলেই জানি এ-ক্ষমতা বিশ্বে কারুরই নেই) সম্ভব বলে মনে করতেন। একবার তিনি এক তরুণীকে নিয়ে এ-বিষয়ে পরীক্ষার আয়োজন করেন। পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল—মানসিক শক্তির সাহায্যে একটি চাবিকে বাঁকিয়ে দেওয়া, যাতে একটি তড়িৎ-বর্তনী

সম্পূর্ণ হয়ে একটি বাল্বকে জ্বালাতে পারে। কঠোরভাবে পরীক্ষাটিকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে প্রাইস সমগ্র সরঞ্জামকে সাবান ও গ্লিসারিনের তৈরি একটি বুদবুদের মধ্যে রেখে-ছিলেন, বুদবুদ সহ সরঞ্জামটি ছিল কাঁচের আবরণের মধ্যে এবং সেটিকে আবার রাখা হয়েছিল তারের খাঁচায়।

এসব সতর্কতা সত্ত্বেও মেয়েটি বাল্বটিকে জ্বালাতে সমর্থ হয়। প্রাইস-এর এই সফল পরীক্ষা সম্বন্ধে Lyall watson তাঁর Natural History of Supernatural' বইতে বলেছেন, 'The report fails to say whether the key was seen to move, which could be important, because we know now that it is possible to induce current from a distance!

প্রাইস-এর এই গবেষণার কথা বলবার কারণ একটিই যে, যথাযথ সতর্কতার সঙ্গে তিনি বরলী রেক্টরি পরীক্ষা করে দেখেননি তা প্রমাণ করা। প্রকৃত-পক্ষে বরলীতে যাবার আগেই প্রাইস ঠিক করে নিয়েছিলেন বাড়িটিকে হানাবাড়ি বলে প্রচার করতে হবে। 1948 সালে 'ডেইলি মেল' পত্রিকায় ভূতপূর্ব রেক্টর স্মিথ-এর স্ত্রী একটি বিবৃতি দিয়ে বলেন বরলীতে ভূতপ্রেত আছে বলে তিনি মানেন না। তাঁর ধারণা রেক্টরিতে উপদ্রবের কারণ হল—ইঁদুর!

মিসেস ফস্টার এর বক্তব্য প্রেতসঙ্ঘের (Ghost club) সভাপতি পিটার আণ্ডারউড-এর কাছ থেকে জানা গেছে। মিসেস ফস্টার বলেছেন দেওয়ালের বিচিত্র লিপিগুলি স্থানীয় বাচ্চাদের লেখা। অবশ্য আণ্ডারউড অন্যান্য প্রমাণ পেয়েছেন যাতে প্রমাণিত হয় মিসেস ফস্টারই নিজের অজ্ঞাতে সেগুলি লিখেছেন। এটি একটি আশ্চর্য মানসিক ব্যাধি। সাধারণতঃ কিশোর বয়সেই এ-রোগের প্রকাশ বেশি ঘটে। রোগটির উৎপত্তি অবদমিত বাসনা কিংবা ক্রোধ থেকে। এরফলে আক্রান্তের মনে জেগে ওঠে পারিপার্শ্বিক সবকিছুর প্রতি এক বিচিত্র প্রতিশোধ স্পৃহা। এই অবস্থায় রোগী রহস্যময় কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, স্বাভাবিক অবস্থায় যার কিছুই তার মনে থাকে না রোগীর মনে আবির্ভূত দ্বিতীয় সত্তাটি হয় অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং এতোই দক্ষতার সঙ্গে কোনো প্রমাণ না রেখে কাজ করে যায় যার ফলে সবটাই মনে হয় পোল্টার গ্রাইস্ট এর কাজ বলে। শ্রী লঙ্কার প্রয়াত যুক্তিবাদী নেতা আব্রাহাম কোভুর তাঁর Begone Godmen! Encounters with spiritual Frauds বইতে লিখেছেন, 'A, poltergeist is nothing but a mentally sick person.' বলা প্রয়োজন যে, এমন ব্যাপারটি অনুমান করেছিলেন প্রাইস নিজেও। এবং এ-ও তিনি খেয়াল করেছিলেন আশ্চর্য সব ঘটনাই ঘটে যখন মিসেস ফস্টার একা ও সকলের নজরের বাইরে থাকেন। তা সত্ত্বেও প্রাইস বরলীকে দিয়েছেন ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ হানা-বাড়ির সম্মান—এ আর যাই হোক, বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধান নয়।

শূন্যে ভাসমান ইঁটের ছবি বিভ্রান্তি বাড়িয়েছে। এটি দেখানো খুব কষ্টকর নয়—ফটোগ্রাফির পরিভাষায় এর নাম ডার্করুম কম্পোজ। এ-পদ্ধতিতে ঝুলন্ত ইঁট দেখানো সম্ভব।

চতুর্দিকে বিভ্রান্তি। অথচ অদ্ভুত পরিচ্ছন্ন এক ইমেজ রেখে গেছেন প্রাইস, যেজন্যে তাঁকে সরাসরি প্রতারক বলা যাচ্ছেনা। তাঁকে প্রিন্স অব পোল্টার গাইস্ট বলে যাঁরা অভিহিত করেন তাঁরাই প্রশ্ন তুলেছেন, Did price believe in poltergeist because be saw so many—or did he see so many because he wanted to?' বরলীর প্রেত সম্বন্ধে জনশ্রুতি এবং পোল্টার গাইস্ট সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাসই তাঁকে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। পোল্টার গাইস্ট ভূত নয়, মানুষ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানীতি অনুসরণ করে কিছুদিন যাজকপত্নী ম্যারিয়ানির ওপর নজর রাখলেই প্রাইস ধরতে পারতেন রেক্টরির গোলমালের উৎস কে। বিজ্ঞানমনস্কতার অভাবে পুরোটাই তাঁর কাছে মনে হয়েছে ভীতিপ্রদ পোল্টার গাইস্টের কাজ বলে।

শুধু বরলী রেক্টরি নয়। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তিপরায়ণতার কাছে 'হানাবাড়ি' (Haunted House) বলে কোনো শব্দ নেই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

(i) The Hamlyn Book of Ghosts
—by Daniel Farson

(ii) শ্রীশোভন ঘোষ

সাতপুকুর বাগান, কোয়ার্টার নং 65/1, কলকাতা-700 002

যুক্তি বুঝি আমরা। কিন্তু যুক্তি দিয়ে যখন কিছু বোঝানো যায় না, ভুগি অস্বস্তিতে। আমাদের অনেক শক্ত বিশ্বাস অতীতেও ভেঙে গেছে বহুবার, ভাঙবে ভবিষ্যতেও। নিয়মের বাইরে অতীতে যা ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। সৃষ্টি ছাড়া আর খাপছাড়াদের নিছক বুজরুকি আর গালগপ্প বলে বিজ্ঞানী মহল উড়িয়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেও যা সত্য তা থেকেই যাচ্ছে। সুদূর অতীত থেকে আজও অনেক উদ্ভট অস্বাভাবিক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে চলেছে। যুক্তি-বুদ্ধি-বিজ্ঞানের কোনো নিয়মের মধ্যে এরা পড়ে না। কোন শক্তি বলে এইসব নিতল প্রহেলিকা বিরাজমান এই জগতে, তা কেউ জানে না।

রহস্যময় পদচিহ্ন

পৃথিবীতে মানুষের যখন থাকার কথা নয়, সেই সময়ে পৃথিবীর বুকে মানুষের পায়ের ছাপ থাকারও কথা নয়। এর চেয়ে অকাট্য যুক্তি আর হতেই পারে না। অথচ নামী দামী পত্রপত্রিকায় এমন সব খবর ছাপা হয়েছে যা পড়ে মনে হয়, দানবিক চেহারার মানুষের মত প্রাণীরা দু-পায়ে হেঁটেছে ধরণীর ধুলোয় কোটি কোটি বছর আগে। জবর রহস্য নিঃসন্দেহে। অলীক কপ্পনাই যদি হবে, এত মেহনৎ এবং খরচ করে প্রকাশকরা ছেপেছেন কেন, তাও তো ভাববার ব্যাপার। ভাবানোর জন্যেই নিশ্চয়। এইসব পত্রপত্রিকার মধ্যে রয়েছে আমেরিকান জার্নাল অব সায়ান্স অ্যান্ড আর্টস, আমেরিকান অ্যানথ্রপলজিস্ট, আমেরিকান অ্যান্টিকোয়ারিয়ান, মিস্ট্রিজ অব টাইম অ্যাণ্ড স্পেশ, বাইবেল-সায়ান্স নিউজলেটার, নেচার এবং ইউ-এস আর্মি রিপোর্ট।

শোনা যাক কয়েকটা সৃষ্টি ছাড়া খবর। 1896 সালে ওহিও স্টেট অ্যাকাডেমি অব সায়ান্সের সদস্যরা স্বচক্ষে দেখেছেন পাথরের বুকে $14\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা সুস্পষ্ট মনুষ্য পদ-চিহ্ন। পাথর যখন পাথর হয়নি, এ ছাপ তখনি আঁকা হয়েছিল নিশ্চয়। সে কত বছর আগে? এত বড় ছাপ যার পায়ের, সে মাথায় কত লম্বা? তিরিশ কোটি বছর আগেকার কার্বনিফেরাস বালি পাথরের স্তরেও দেখা গেছে মানুষের পায়ের ছাপ কেনটাকির কামবারল্যাণ্ড পাহাড়ে। কেনটাকির রককাসল্ কাউণ্টির পাহাড় অঞ্চলের পাওয়া গেছে $9\frac{1}{2}$ লম্বা পায়ের ছাপ। এ পাথরের বয়স পঁচিশ কোটি বছর। নর্থ ক্যারোলিনার টেনেসি নদী অঞ্চলের এক নিরেট পাথুরে জায়গায় দেখা গেছে 16 ইঞ্চি লম্বা অদ্ভুত দানব-সদৃশ মনুষ্য পদচিহ্ন। সাতাশ কোটি বছর আগে শক্ত হয়ে যাওয়া মিসিসিপি নদী অঞ্চলের চুনা পাথরেও $10\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা দ্বিপদ মানুষের পায়ের ছাপ।

পৃথিবীতে মানুষ বিচরণ করার ছ কোটি বছর আগে ডাইনোসররা লোপ পেয়েছিল আমরা জানি। তাই বুঝতে পারি না ডাইনোসর আর মানুষের পায়ের ছাপ পাশাপাশি হেঁটে যায় কি করে। কখনো পায়ের ছাপগুলো ওপর-ওপর পড়েছে। জালিয়াতি যে নয়, তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধরা পড়েছে। এই ছাপ দেখা গেছে টেক্সাসের পালুক্সি নদীর আশেপাশে। ছাপের ছাঁচ নিয়ে পর্যটকদের কাছে বেচে দু পয়সা রোজগারও করছে স্থানীয় লোক।

নিউমেক্সিকোর গ্রেট হোয়াইট স্যাণ্ডস মরুভূমিতে 16 থেকে 22 ইঞ্চি লম্বা অতিকায় পদচিহ্ন দেখা গেছে 1931 সালে। পদ ভারে এবং দেহ ভারে বালি এতই শক্ত হয়ে গেছে যে আশপাশ থেকে বালি ঝড়জলে সরে গেছে—কিন্তু পায়ের ছাপের জায়গাটা আজও উঁচু হয়ে রয়েছে এবং আরও উঁচু হচ্ছে। এত ভারি যার দেহ সে মানুষ না মনুষ্যেতর প্রাণী, তা নিয়ে মত বিরোধ দেখা গেলেও ছাপগুলো সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে অবিশ্বাসীদের দেখানোর জন্যে।

এ তো গেল সব নগ্ন পদচিহ্ন। তিরিশ থেকে ষাট কোটি বছর আগে জুতো পরে দ্বিপদ প্রাণী হেঁটেছে পৃথিবীর বুকে, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? তখন তো মেরুদণ্ডী প্রাণীই জন্মায়নি এই গ্রহে। চটি জুতোর মাপ $10\frac{1}{4}$ ইঞ্চি চাওড়ায় $3\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। ট্রাইলোবাইট নামে ক্ষুদে ক্ষুদে সামুদ্রিক জীবদের সে কখনো মাড়িয়ে গেছে, কখনো পাশে হেঁটেছে। উটাতে এই বিস্ময়কর চটিজুতোর প্রস্তর-চিহ্ন দেখা যায় 1968 এর জুন মাসে। বৈজ্ঞানিক যুক্তির কচকচানির

[শেষাংশ 47 পৃষ্ঠায়]

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

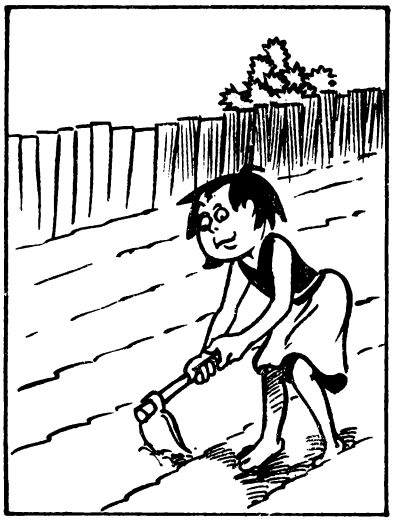

যাক্, তোর বাগান করা দেখে ভালই লাগছে। এখন আমাদের অনেক গাছ চাই। একটি গাছ একটি প্রাণ।
বেশী বকবক না করে পায়ে ঠাণ্ডা জল দিগে যা আরাম পাবি। আমাকে কাজ করতে দে।
নিশ্চয়ই। বাগান করা একটা পূণ্য কাজ। তবে তুই চাস তো কিছু ভাল গাছ সাপ্লাই করতে পারি— শিমুল পিপল সুন্দরী তমাল গরান—
তোকে আর এ জন্যে পরিশ্রম করতে হবে না। আমার গাছ রেডি আছে, দ্যাখ।
কী গাছ এগুলো?
পেঁয়াজ গাছ।
পেঁয়াজ! তু-তুই শেষকালে পেঁয়াজ গাছ লাগাতে বসেছিস?
কেন? পেঁয়াজ কি গাছ নয়?
ঘাসও তো গাছ, ওকে কি বৃক্ষ বলা যায়? চাই বৃক্ষ, যার থেকে পাওয়া যাবে প্রচুর অক্সিজেন, ভাল কাঠ আর জ্বালানি। পেঁয়াজে কি আছে?
খুদে, তোর মুখে এ রকম উক্তি শোভা পায় না!
মেজকা!!
মরেছে, এবার পেঁয়াজি দেখিয়ে ছাড়বে! মনে হচ্ছে
গাছের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আর প্রত্যেকটি গাছেরই কম-বেশী উপকারীতা আছে। সে ক্ষেত্রে পেঁয়াজও ফেলনা নয়।

এটা ঠিক যে, পেঁয়াজ একটা টেস্টফুল সবজি।
চপ্ কাটলেট্ মাছ-মাংস তো পেঁয়াজ ছাড়া কল্পনা করাই যায় না!
ঠিক বলেছিস পেঁয়াজের একটা বিরাট ভেষজ গুণও আছে।
এ্যাট্ ফার্স্ট, জেনে রাখ— হার্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে পেঁয়াজ এক অব্যর্থ ওষুধ।
বুঝলি না? মানে— হৃদরোগ।
কথায় কথায় ফুট্ কাটা খুদের একটা মহা দোষ।
আমাদের শিরায় যে রক্ত চলাচল করে অনেক সময় তা জমাট বেঁধে যায়। ফলে হয় হার্ট অ্যাটাক্। ফাইব্রিন নামক একটি উপাদান এই জমাট বাঁধার কলকাঠি করে। এখানে পেঁয়াজ উপাদানটিকে তরল করে রক্তকে চলাচল উপযোগী করে দেয়।
মেজকা, তুমি কিন্তু বট্যানি থেকে ফিজিওলজিতে চলে যাচ্ছ।
পৃথিবীতে কোন জিনিসটা একক ভাবে চলছে বলতে পারিস? গাছ-পালা জীব-জন্তু পোকা-মাকড়— কেউ কাউকে ছাড়া চলতে পারে না। ফিজিওলজি জিওলজি একোলজি বট্যানি— এ সব তো খালি শ্রেণী বিভাগ।
কিন্তু খুদে তখন আমার পেঁয়াজ দেখে নাক সিঁটকাচ্ছিল মেজকা।
খুবই অনুচিত হয়েছে। কারন, পেঁয়াজ দাঁতের রোগ, চক্ষুরোগ আমাশা ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি রোগেও অনেক উপকার দেয়।
তুমি যাই বল না কেন খুদে, ব্যাপারটা মোটেই পেঁয়াজী নয়!
মেজকা, আমি বলছিলুম শুধু গাছের কথা। যার অভাবে পৃথিবী এখন রসাতলে যেতে বসেছে! এই সময়ে পেঁয়াজ—
ঠিক কথা। তবে কেলোটাই কিন্তু ফেলনা নয়! ঝুটকি পেঁয়াজ বসাচ্ছে, তুমি আম জাম ইউকেলিপটাস্ যা পারো বসাও।
মোট কথা হল, বাতেলা না দিয়ে যে যা পারো গাছ বসাও।

খুবই ভাল কথা বলেছিস ফুটকি। তবে পেঁয়াজ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলবো। তোরা জানিস, গরমের দেশে গ্রীষ্মকালে লু বয়। সেখানে লুর হাত থেকে রক্ষা পেতে লোকেরা পেঁয়াজ ব্যবহার করে।
তুমিও তো কম বাতেলাবাজ নও দেখছি!
আচ্ছা মেজকা ঐ সময় পেঁয়াজ কি কাঁচা খেতে হয়? নাকি বেটে মাথায় মাখতে হয়?
ধ্যাৎ, ওসব কিচ্ছু নয়! ঐ সময় লোকেরা একটা কাঁচা পেঁয়াজ হাতে রাখে, আর মাঝে মাঝে একটু খুঁটে তার গন্ধ নেয়। এতেই উপকার।
পেঁয়াজের ঝাঁঝটাই বোধহয় লুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে
খুব তো গাছ গাছ করছিলি। শুনলি তো পেঁয়াজগাছ কতটা মূল্যবান।
হ্যাঁ। তুই এবার আদা রসুন আর লংকার চাষও একই সঙ্গে আরম্ভ করে দে।
চাষাবাদের প্ল্যান!
এতে তোর একটা ছোট-খাট মশলাদার বাগান তৈরী হয়ে গেল। এখন খালি দরকার একটা খামি
তাতে কি, তুই তো আছিস।
আমি আছি! মানে—আমাকে তুই—
হ্যাঁ, তুই খামি সাপ্লাই করবি। আমার মশলা আর তোর মাংস, ব্যাস হয়ে গেল।
এবার কোদালটা দিয়ে বাকি জায়গাটা কুপিয়ে ফেল। আমি চারাগুলো বসিয়ে দিই।
বেশ হয়েছে, এখন বোঝ ঠেলা! তাই তো বলি সবেতে কেন পেঁয়াজটা মারতে যেও না।
আঁ!

মানব সভ্যতার বন্ধু কালি

ধ্রুব মুখোপাধ্যায়

কালি কথাটি বাংলায় কবে থেকে চালু তা জানা বেশ মুস্কিল। "কালো রং থেকে কালি-এ অর্থ ছাড়া, "কাল" কথাটার সঙ্গে কালির একটা সম্পর্ক মনে এসেই যায়। কালি নেই লেখাপড়া বন্ধ, খবরের কাগজ বন্ধ, টাইপরাইটার বন্ধ, বই ছাপা বন্ধ, দাগ টেনে রেকর্ড করার যন্ত্রপাতি বন্ধ। সামান্য জিনিস কালি, কিন্তু কি অসামান্য তার শক্তি। "পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান সোর্ড" অসিযুদ্ধের সঙ্গে মোকাবিলা করে যে মসীযুদ্ধ তাতে শুধু কলম কিছু না, যদি না কালি তার শক্তি জোগায়।

আনুমানিক 2500 খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকেই মিশরে এবং চীনে কালির ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এই কালি তৈরি হত নানা গাছগাছড়ার রস, প্রাণীদেহ বা কীট দেহের রস বা নানা খনিজ থেকে। এর মধ্যে নীল, ম্যাজেন্টা (বা অ্যালিজারিন) এরা যেমন উদ্ভিজ্জ উপাদান ছিল প্রাচীন কালির তেমনি একজাতের লাক্ষাকীটের দেহরস থেকে কোচিনীল, "কাট্‌লফিশ" নামে মাছের পেটের থলির বাদামী রস থেকে "সিপিয়া" ব্যবহার হত। "গল মাছি" বলে একজাতের মাছি যখন কোন কোন গাছে বাসা বাঁধে, তখন গাছে একরকম ফোড়ার মত গুটি দেখা দেয়, এর নাম "গল"। একে জলে ফোটালে কতকগুলো অ্যাসিড পাওয়া যায়—যাদের নাম, গ্যালিক অ্যাসিড, ট্যানিক অ্যাসিড। এই ট্যানিক অ্যাসিডের সঙ্গে দ্রাব্য ফেরাস লবন, ফেরাস সালফেট বা হীরাকস মিশিয়ে প্রাচীনকালে কালো কালি তৈরি করার সবচেয়ে বেশি প্রচলন ছিল।

বিখ্যাত "চাইনিজ ইংক" বা চীনাকালি তৈরির সময়টা প্রায় 500 খ্রিষ্টাব্দ। এটি আদিতে তৈরি হয়েছিল ভূষা-কালির সঙ্গে কিছু খনিজ আর বিশেষ কিছু তেল ও জল মিশিয়ে। এটি আদি ছাপার কালিও বটে। 1400 সালে গুটেনবার্গ যখন ছাপার যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন, তখন তার উপযুক্ত ছাপার কালিরও দরকার পড়ল। ঐ কালি তিনি তৈরি করে নেন, চাইনিজ ইংক তৈরির রকমফের করে, মানে ভূষাকালির সঙ্গে তিসির তেল আর বার্নিশ্ মিশিয়ে।

কিন্তু চাইনিজ ইংকের আগে ভারতবর্ষে অনুরূপ এবং শ্রেষ্ঠতর কালি নিশ্চয়ই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কতকাল আগের সব প্রাচীন তালপাতার পুঁথিতে দেখা যায় জ্বলজ্বলে ভারতীয় কালি, যার নাম "ইণ্ডিয়া ইংক"। এ কালি তৈরি হত, জলের সঙ্গে ভূষাকালি বা দূষণ-কার্বনচূর্ণ, গালা, সোহাগা, জিলাটিন, গঁদ, গাছপালার রস মিশিয়ে এবং খলনুড়িতে দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে মিহি করে মেড়ে।

প্রাচীন ভারতে কালি তৈরিতে নানা গাছের রস ব্যবহার করা হত; তার ভেতরে ছিল—নিম ভৃঙ্গরাজ, ত্রিফলা। লাক্ষারস, হীরাকসও ছিল। রঙীন কালির জন্য ব্যবহার হত —কালোর জন্য—ভূষাকালি বা চালপোড়া; হলুদের জন্য —হরিতাল বা আর্সেনিক সালফাইড; সাদার জন্য —শাঁখের গুড়ো; রক্তাভ বাদামীর জন্য—রেডলেড; টকটকে লালের জন্য—অলক্তক বা আলতা; গাঢ় লালের জন্য—গেরিমাটি। চালপোড়ার সঙ্গে ভূষা, অল্প চিনি। কেশুর্তে ও গঁদ মিশিয়ে তৈরি হত তালপাতা বা পুঁথি লেখার কালি।

নানা রঙের লেখার কালির পেটেন্ট নেওয়া হয় ইংল্যাণ্ডে ১৭৭২ সালে। উনিশ শতকে ছাপার কালির জগতে যুগান্তর এল, যখন সহজে শুকিয়ে যায় এমন সব তরল রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হতে লাগল। এরই ফলে এক ঘেয়ে লাল, নীল, কালো, ব্লু-ব্ল্যাক কালির জায়গায় হাজির হতে লাগল নানা নতুন নতুন রঙের কালি। বার্নিশের বদলে খনিজ তেল ব্যবহার হওয়াতে, ছাপার কালিও আরও উপযোগী হয়ে উঠল, কারণ কালির তেল অংশটা নিউজ-প্রিন্টের কাগজতন্তুকে ভিজিয়ে দেওয়াতে কালির ছাপ গভীর হয়ে বসতে লাগল, শুকোতেও লাগল তৎক্ষণাৎ। আজ বিশ শতকে, কালি শিল্প অনেক জটিল জটিল উপাদান ব্যবহার করছে। অনেক জটিল যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে, বড় কালির কারখানায়। যন্ত্র ব্যবহার করাতে কালির মান এখন অনেক উন্নত হয়েছে।

লেখার কালি উপযোগী হতে হলে কতকগুলো শর্ত

পূরণ করতে হয়। প্রথমতঃ কালি তৈরিতে দ্রাব্য রং ও অজৈব কিছু উপাদান থাকে। সেগুলো দীর্ঘকাল সমসত্ত্বভাবে মিশ্রিতরূপে থাকতে হবে, থিতিয়ে গেলে চলবে না; দ্বিতীয়তঃ লেখার সময় একটি যথাযথ তারল্য বা সরল প্রবাহমানতা থাকবে, জমাট বাঁধবে না; তৃতীয়ত লেখার পর কালি ছড়িয়ে পড়বে না, এবং দ্রুত শুকিয়ে যাবে; চতুর্থতঃ, শুকিয়ে যাওয়া কালি আলো হাওয়ার সান্নিধ্যে ম্যাড়মেড়ে, বিবর্ণ হয়ে যাবে না।

এইসব গুণ তৈরি করতে এখনকার কালিতে নানা জিনিস মেশান হয়। ব্লু-ব্ল্যাক কালি তৈরি হয়—মূল উপাদান গল-এর সঙ্গে অ্যানিলীন আর হীরাকস মিশিয়ে। ফাউন্টেন পেনের নানা রঙের সব কালি তৈরি হয়—নিগ্রোসিন, অ্যানিলীন বা অন্য সব রং দিয়ে, সঙ্গে থাকে সামান্য অ্যাসিড এবং গ্লিসারিন, ছাতা পড়া রোধ করার উপাদান (ফার্ংগিসাইড), মিশ্রকে না থিতিয়ে স্থায়ী রাখার উপাদান বা স্টেবিলাইজার গঁদ নানা দ্রাবক ইত্যাদি দিয়ে।

ডটপেনের কালি তৈরি হয়, রংকে ইথিলীন গ্লাইকল দ্রাবকে দ্রবীভূত করে। ডটপেনে লেখা বন্ধ করলেই, দ্রাবকটা হাওয়ায় শুকিয়ে একটি কঠিন ফিল্ম তৈরি করে কালির প্রবাহ বন্ধ করে দেয়। আবার চাপ দিয়ে লেখা শুরু করলেই, ফিল্মটা ভেঙ্গে দ্রাবকসহ রঙের প্রবাহ বেরতে থাকে।

কপিং কালি, স্ট্যাম্প প্যাডের কালি, টাইপরাইটারের রিবণের কালি-এগুলো ভেসেনীল ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দ্রাবকে বেগুনী কালো প্রভৃতি রঙ মিশিয়ে তৈরি হয়, সঙ্গে থাকে গ্লিসারিন, যাতে কালি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে না যায়। কার্বন পেপারের কালিও অনুরূপ পদ্ধতিতে তৈরি, এতে হাল্কা মোম থাকে। এসব কালিতে জল একেবারেই থাকে না।

"আঁকার কালি বা চাইনিজ ইংকে"ও জল থাকে না। ভূষাকালির সঙ্গে গালা, সোহাগা, অ্যামোনিয়া এবং উপযুক্ত দ্রাবক মিশিয়ে এগুলো তৈরি হয়। এগুলো জলে ভিজলেও উঠে যায় না, আর গালা ইত্যাদি থাকার জন্য একটা চকচকে ভাব থাকে।

ডাইং-ক্লিনিংয়ের দোকানে কাপড় জামায় মার্কা দেবার জন্য এক ধরণের কালি ব্যবহার হয়, যাকে বলে "মার্কিং ইংক"। এগুলোর উপাদান সিলভার নাইট্রেট, যাতে কালির মার্কা আলোর সংস্পর্শে এসে কালো ধাতব সিলভার হয়ে যায় আর জলে ধুয়ে যায় না।

ধাতুর উপরে লেখার জন্য আরেক ধরনের কালি ব্যবহার করা হয়। এর নাম "মেটাল মার্কিং ইংক"। সোডিয়াম সিলিকেটের সঙ্গে ইণ্ডিয়া ইংক মিশিয়ে এটি করা যায়। ধাতুর প্রকৃতিভেদে অন্যভাবেও করা যায়। "ফ্লুওরেসেন্ট কালি" তৈরি এবং ব্যবহার হয়, ফ্লুওরেসেন্ট বা প্রতিপ্রভ রাসায়নিক বস্তুকে গলিত প্লাস্টিকে গুলে, পরে প্রলেপরূপে ব্যবহার করা হয়।

ছাপার কালির আরেকটি অবদান ইনট্যাগলিও ইংক (Intaglio ink)। এগুলোতে দ্রাবকরূপে থাকে—পেট্রোলিয়াম, ন্যাপথা, রজন, আলকাতরাজাত নানা দ্রাবক। এগুলো দিয়ে বেশীরভাগ মোড়ক, লেবেল ইত্যাদি ছাপা হয়।

আজকাল প্লাস্টিকের জিনিসে বাজার ছেয়ে গেছে। প্লাস্টিকের উপর ছাপা হয় যেসব কালি দিয়ে তাদের "অ্যানিলিন ইংক" বলা হয়। এতে থাকে-রঙের সঙ্গে মিথাইল অ্যালকোহল, কৃত্রিম রজন, কোল্যাক বা লাক্ষা ইত্যাদি।

তোমাদের কালি তৈরির একটি প্রয়োজনীয় কাঁচামালের তালিকা দিচ্ছি, যা তোমাদের মাধ্যমিক কর্মশিক্ষার একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষবস্তু ঃ—

কালি তৈরির উপকরণ ঃ

প্রথম পাত্রে—		
জল	—	1750 গ্রাম
গ্যালিক অ্যাসিড	—	20 গ্রাম
ট্যানিক অ্যাসিড	—	6 গ্রাম
দ্বিতীয় পাত্রে ঃ		
জল	—	1000 গ্রাম
ফেরাস সালফেট	—	20 গ্রাম
গঁদ	—	5 গ্রাম
এ ছাড়া লাগবে—		
100% কার্বলিক অ্যাসিড	—	3 ঘনসেমি বা 3 মিলি
50% সালফিউরিক অ্যাসিড	—	5 ঘনসেমি বা 5 মিলি
রেকটিফায়েড স্পিরিট	—	10 মিলি
ইংক ব্লু বা কালির গুড়ো	—	15 গ্রাম

এবার তোমাদের বিভিন্ন জিনিসগুলোর কার্যকারিতার সম্বন্ধে একটা ধারণা দিচ্ছি, যাতে করে তোমাদের উপরের রাসয়নিক বস্তুগুলো সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হয়ে যায়। যাতে কালি ঘন থাকে, সেজন্য গ্যালিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। ট্যানিক অ্যাসিড কালিতে কালো রং আনে, ফলে কালি কেটে যায় না। ফোরাস সালফেট বা হিরাকস কালির রং-কে স্থায়ী করে। কালির রং যাতে উজ্জ্বল থাকে সেজন্য অ্যাসিড-গুলো ব্যবহার করা হয়, তবে বেশীমাত্রায় অ্যাসিড ব্যবহার করলে কলমের নিব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। কাগজে লেখা কালির চিহ্ন যাতে সহজে উঠে না যায় সেজন্য গঁদ

ব্যবহার করা হয় এবং রেকটিফায়েড স্পিরিট এর কাজ হল লেখবার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের কালি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে দেওয়া।

আবার কালি কলমে মিললেই তক্ষুণি লেখা ফুটবে এ ধারণাটা ঠিক না। এমন উপাদানের কালি আছে, যা দিয়ে কাগজে লিখলে তক্ষুণি লেখা ফোটে না, মনে হয় সাদা কাগজে কিছুই লেখা নেই। এ কালিকে বলা হয় "অদৃশ্য কালি" বা "ভ্যানিশিং ইংক"। কাগজের উপর অদৃশ্য, কালিতে এমনি লেখা, সাধারণভাবে যা অদৃশ্য থাকে —মানে কাগজটাকে আগুনে ধরলে, বা জলে ফেললে লেখা ফুটে উঠে। এই কালি ব্যবহার করা হত যুদ্ধের সময় সাধারণতঃ গুপ্তচরেরা এমন কালি ব্যবহার করত। তোমাদের কতকগুলো মজার মজার অদৃশ্য কালির কথা বলা যাক।

প্রথমটি হল সাধারণ কোবাল্ট ক্লোরাইড ($COCl_2 6H_2O$)। এটার রং ফিকে গোলাপী। জলে গুলে, এ দিয়ে লিখে কাগজটা শুকিয়ে নিলে, সাদা চোখে মনে হবে যেন কিছুই লেখা হয় নি। কিন্তু কাগজটাকে আগুনের উপর ধরলে, সুন্দর নীল লেখা ফুটে উঠবে। কিছুক্ষণ রেখে দিলে, লেখাটা আবার ভ্যানিশ হয়ে যাবে। এর কারণটা হল, যেদিক কোবাল্ট ক্লোরাইড উত্তাপে কেলাসজল হারিয়ে নিরুদক কোবাল্ট ক্লোরাইডে ($COCl_2$) পরিণত হয় যার রং নীল। ঐ নীল ক্লোরাইড বাতাস থেকে আর্দ্রতা শোষণ করে আবার ফিরে যাচ্ছে গোলাপী সেদিকে কোবাল্ট ক্লোরাইড-রূপে এবং নীল রং আর থাকছে না।

আর একটা ভ্যানিশিং কালি হল—গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড। এ দিয়ে কাগজে লিখলে প্রথমে লেখা দেখা যাবে না। আগুনে কাগজটা ধরলে কালো লেখা ফুটবে। এবং কারণ হল কাগজ সেলুলোজ বা কার্বনের বৃহৎ জৈব যৌগ। অ্যাসিডের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভেঙ্গে গিয়ে কালো কার্বনে পরিণত হয়। তাই কালো লেখা। এটা অবশ্য রেখে দিলে মিলিয়ে যাবে না, কেননা পরিবর্তনটা স্থায়ী।

ফিনোলপথ্যালিন বলে একটা নির্দেশক আছে, যা অ্যাসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ার প্রশমনক্ষণ নির্দেশ করে। এটাকে অ্যালকোহলে গুলে নিয়ে, তা দিয়ে কাগজে লিখলে সাদা চোখে কিছু বোঝা যায় না। এই কাগজটা অ্যামোনিয়া গ্যাস বা অ্যামোনিয়া দ্রবণের বোতলের উপর ধরলে গোলাপী লেখা ফুটে উঠে, আবার হাওয়ায় কিছুক্ষণ রেখে দিলে মিলিয়ে যায়। এক্ষেত্রে ক্ষারধর্মী অ্যামোনিয়ার সংস্পর্শে এসে ফিনোলপ্থ্যালিন গোলাপী হয়ে যায়, কিন্তু বায়ুর সংস্পর্শে যেই অ্যামোনিয়া উড়ে যায় তখন কেবল বর্ণহীন ফিনোলপ্থ্যালিন পড়ে থাকে।

সুতরাং তোমরা সহজেই বুঝতে পারছ যে, লেখকের লেখনীর অন্যতম শক্তি হল কালি। মানব সভ্যতার বিকাশ, ধ্যান ধারণা, বুদ্ধিবৃত্তির অন্যতম প্রেরণা প্রদানকারী শক্তি হল "কালি"।

রসায়ন বিভাগ, বিড়লা কলেজ অফ সায়েন্স এণ্ড এডুকেশন
কলকাতা-20

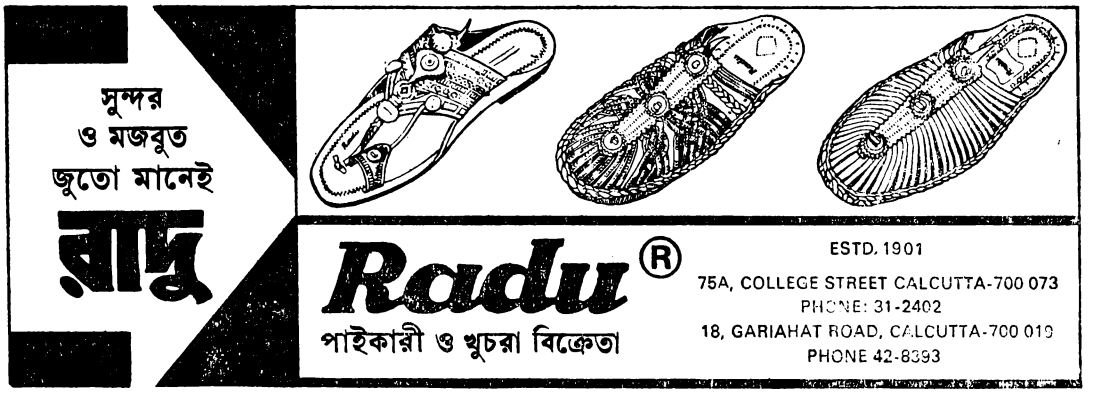

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ বরুণ মজুমদার

বিচিত্র ঘড়ি

আজ থেকে এক শত বছরও আগে 1873 সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে বিলিটেট নামে এক ভদ্রলোক তৈরি করেছিলেন এক বিচিত্র ঘড়ি। ঘড়িটার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, একসঙ্গে 37টি দেশের সময় এতে নির্দেশ করা ছিল। যে কেউ ঘড়ি দেখে ঐ সব দেশের সময় জানতে পারতেন। এছাড়া গ্রহ নক্ষত্র ও তিথিও এ থেকে জানা যায়। ঘড়িতে ব্যবহার করা হয়েছে 25টি স্প্রিং। ঘড়িটি তিন হাত চওড়া ও 2·১ মিটার লম্বা। এটি সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি। 1911 সালে স্যালে ডি বেরিলিন নামে এক ভদ্রলোক নিলামে ঘড়িটি কেনেন। তিনি সেটি তার নিজের বাড়িতে মিউজিয়ামে তা রেখে দিলেন। কিন্তু তখন ঘড়িটি ছিল অচল। দীর্ঘদিন এইভাবে অচল হয়ে পড়ে থাকার পর 1943 সালে তার এক অধ্যাপক বন্ধু ঘড়িটি চালু করেন। ঘড়িটি এখনো চালু অবস্থায় রয়েছে।

সবচেয়ে উঁচুতে পেট্রোল পাম্প

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচুতে একটা পেট্রোল পাম্প সম্প্রতি গড়ে তোলা হয়েছে। সেটা ভারতেই অবস্থিত, আর সেই জায়গাটা হল কাজা। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা সাড়ে 13 হাজার ফিট: ঐ অঞ্চলে আদীবাসীদের বাস। জায়গাটা একটা পাহাড়ের ওপর। ঠাণ্ডাও প্রচণ্ড। তবে সেখানে আছে কাছাকাছি একটা পর্যটন কেন্দ্র এবং অনেক সরকারী অফিস। ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এই পেট্রোল পাম্পটি বসিয়েছে।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পেট্রোল পাম্পের এই সম্মান পেয়েছে নতুন ওই পেট্রোল পাম্পটি। কিন্তু এর আগে পর্যন্ত এই গৌরবের স্থান দখল করেছিল লে-র পেট্রোল পাম্পটি। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা সাড়ে 11 হাজার ফিট। সুতরাং লে-র স্থান এখন দ্বিতীয়। হাজারহোক দু-হাজার ফিটের তফাৎ তো! সুতরাং এখন আর বলার কিছু নেই।

গানের মুরগী

ডিস্কো গান শোনালে গরু নাকি বেশি দুধ দেয়, এমন একটা খবর কিছুদিন আগে বেশ সোরগোল তুলেছিল। বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন যে, গরুর দুধ দুইবার সময় ডিস্কো গান বাজালে গরুর দুধের পরিমাণ বেশ কিছুটা বেড়ে যায়।

গানের ছন্দে মুরগীর ছানারা হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে এ খবরটা এখন একেবারেই 'লেটেস্ট'। গবেষণার ফলে জানা গেছে যে ডিম ফুটে মুরগীর বাচ্চা বের হবার সময় গান বাজালে মুরগীছানারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েই বেরিয়ে আসে। অবশ্য গরুদের মত এদের ঐ ডিস্কো গানে মন মাতানো যাবে না। এদের রুচিটা বোধ হয় একটু উচ্চাঙ্গের। তাই ঐ সময় যে সে গান হলে চলবে না, চাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। ধ্রুপদী গান মুরগীদের চারগুণ পর্য্যন্ত মোটা করে দিতে পারে। এটাকে মোটেই বাজে কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কেননা জেরুজালেমে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ ডঃ গাডি গুরিয়ারিয়ানু রীতিমত গবেষণা করে এই তথ্য আবিষ্কার করেছেন। বর্তমানে মুরগীরা তা দিয়ে ডিম ফোটায় খুব কম। সাধারণতঃ ইনকিউবেটরে মুরগীর বাচ্চা ফোটানো হয়। এর ফলে নাকি মুরগীর বাচ্চারা ভয়ানক রকমের স্বার্থপর হয় এবং একই মায়ের পেটের ডিম ফুটে বের হওয়া বাচ্চারা পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করে জখম হয়। কিন্তু গানের মধ্য দিয়ে বড় হওয়া বাচ্চারা নাকি এরকম হয় না। তারা বেশ সুখে থাকে এবং নাদুস-নুদুস হয়ে থাকে।

আঃ উঃ-নদী শহর

'আঃ' 'উঃ'! না এটা কোনো খেদোক্তি নয়। আঃ হল একটা নদীর নাম। আর এই নদীটা আছে ফ্রান্সের পা-ডি-ক্যালে নামক জায়গায়।

'উঃ হল একটা শহর ও হ্রদের নাম। দক্ষিণ ফ্রান্সের হাউতেগারোনেতে এই শহর ও হ্রদটি অবস্থিত। এই শহর ও হ্রদ দেখতে হলে তোমরা সোজা চলে যাও ফ্রান্সে। অবশ্য তার আগে পাশপোর্ট আর টাকাটাতো দরকার। থাক, না গেলেও ব্যাপারটা জেনে রাখো।

পিরামিডের দেশে

পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের অন্যতম হল মিশরের পিরামিড। এই পিরামিড নিয়ে আমাদের মানুষের গর্বের অন্ত নেই। অথচ আমরা অনেকেই এই পিরামিড নির্মাণকারীদের খবর রাখি না। খবর রাখি না তাঁরা কোথায় কেমনভাবে থাকতেন। পৃথিবীতে সর্বদাই ঘটনা ঘটে চলেছে। এসবের মধ্য দিয়েই আমরা অজানা তথ্য জানতে পারি। ঠিক এমনিভাবেই জানা গেছে মিশরের পিরামিড নির্মাণকারীদের সম্পর্কে নতুন তথ্য। একদল মার্কিন পুরাতত্ত্ববিদ মিশরের গীজা অঞ্চলে যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগেকার এই সব পিরামিডের নির্মাণকারী শিল্পীদের বাসস্থান খুঁজে পেয়েছেন। অবশ্য মাটির নিচে খননকার্য্য চালিয়ে এই বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে। পিরামিডের এই নির্মাণকারী কর্মীরা থাকতেন যে সব ঘরে তার উচ্চতা ছিল পাঁচ মিটার আর ঘরগুলি চওড়া ছিল মাত্র এক মিটার। ঘরের দেওয়াল ছিল পাকা। সেখান থেকে মাটির তৈরি কিছু বাসনপত্র ও মানুষের হাড়ও পাওয়া গেছে। এগুলি খ্রীষ্টপূর্ব 2 হাজার 7শো 5 থেকে 2 হাজার 1 শো 55 বছর বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই সব জিনিসপত্র থেকে পিরামিড তৈরি ও সেই কাজে নিযুক্ত কর্মীদের সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য পাওয়া যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছেন।

এবারে ফোবোস অভিযান

বিমান বসু

1988 সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাতের আকাশে লালচে হলদে রং-এর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে তোমাদের অনেকেই হয়ত দেখেছ। ঐ জ্যোতিষ্কটিই সেই বহুকথিত গ্রহ মঙ্গল। ঐ লাল গ্রহটির প্রতি মানুষের আকর্ষণ বহু-দিনের। ছোটবেলা থেকেই আমরা মঙ্গল গ্রহে বুদ্ধিমান জীবের কথা শুনে এসেছি। স্বর্গীয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের জনপ্রিয় বই 'মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা'তে আমরা মঙ্গলবাসী জীবের কথা পড়েছি। তারও অনেক আগে, 1897 সালে এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌ তাঁর "দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্লড্‌স্‌" বইয়ে মঙ্গলের বুদ্ধিমান বাসিন্দাদের দ্বারা পৃথিবীর মানুষের ওপর আক্রমণের এক চাঞ্চল্যকর বর্ণনা দিয়েছিলেন।

কিন্তু শুধুমাত্র মঙ্গলকে নিয়েই এ ধারণা কেন? আমরা তো কখনো শুক্র বৃহস্পতি বা শনিগ্রহে বুদ্ধিমান জীবের কথা ভাবিনা। এমনকি মঙ্গলগ্রহে আজ পর্যন্ত যে সব গ্রহযান নামানো হয়েছে সেগুলিরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সেখানে জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা তা খুঁজে দেখা। অথচ আজ পর্যন্ত এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি যার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে মঙ্গল গ্রহে জীব আছে।

কিন্তু মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। তাই বার বার নিষ্ফল হওয়া সত্বেও সে তার চেষ্টা চালিয়ে যায়। মঙ্গলে জীবের সন্ধানের বেলাতেও তাই। গত 1976 সালে দু'টি মার্কিন 'ভাইকিং' গ্রহযান মঙ্গলের মাটিতে নামানোর বারো বছর পর গত জুলাই মাসে আবার দু'টি গ্রহযানকে লাল গ্রহটি অভিমুখে পাঠানো হয়েছে। এবারে 'ফোবোস' নামক গ্রহযান দু'টিকে পাঠিয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া। যদিও একটি গ্রহযান ইতিমধ্যেই অকেজো হয়ে পড়েছে, বিজ্ঞানীরা আশা করেন অপরটি আগামী জানুয়ারিতে মঙ্গলে গিয়ে পৌঁছবে।

'ফোবোস' অভিযানের বিষয় কিছু বলার আগে দেখা যাক মঙ্গলকে নিয়ে মানুষের কৌতূহলের মূলে কি কারণ রয়েছে। আগেই বলেছি যে ঐ কৌতূহলের এক প্রধান কারণ সেখানে বুদ্ধিমান জীব আছে বলে আমাদের ভ্রান্ত

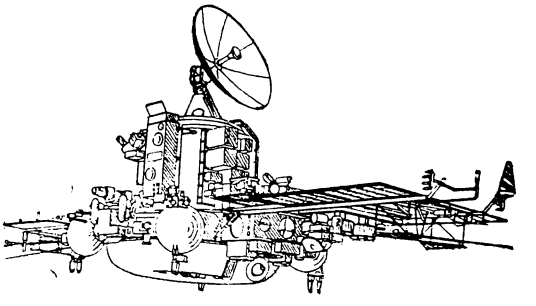

'ফোবোস' গ্রহযান

ফোবোস গ্রহযান

ধারণা। যে কোনও গ্রহে জীবের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব কিনা সেটা নির্ভর করবে সেখানকার পরিবেশ কি ধরণের তার ওপর। যেমন ধরো, যদি কোনও গ্রহের তাপমান খুব কম বা খুব বেশি হয় তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে কোনও জীবের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আবার আমাদের পৃথিবীতে যত রকমের জীব আছে তারা প্রায় কেউই জল ছাড়া বাঁচতে পারে না। সুতরাং কোনও গ্রহে পৃথিবীর মত জীব বেঁচে থাকার জন্য সেখানে জল থাকাও নিতান্ত প্রয়োজন। এসব দিক দিয়ে দেখতে গেলে কিন্তু মঙ্গলের পরিবেশ সৌরমণ্ডলের বাকি গ্রহগুলির তুলনায় অনেক বেশী সহনীয়।

গত দশকে মহাকাশ অভিযান চালিয়ে জানতে পারা গেছে যে মঙ্গলের নিরক্ষরেখার আশেপাশে তাপমান সেখানের গ্রীষ্মকালে দিন+22°সে. এবং রাতে—53° সে. থাকে। অবশ্য শীতকালে ঐ তাপমান—130°সে. পর্যন্ত নেমে যেতে দেখা গেছে।

নিরক্ষরেখার আশেপাশের তাপমান ছাড়াও কিছু বিষয়ে পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গলের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে পৃথিবী তার অক্ষতলে সাড়ে তেইশ ডিগ্রী হেলে রয়েছে এবং সেজন্যই পৃথিবীতে ঋতুচক্র আছে। মঙ্গলও তার অক্ষতলে হেলে রয়েছে এবং তার অক্ষের নতির পরিমাণ 25 ডিগ্রী। মানে প্রায় পৃথিবীর অক্ষের নতিরই সমান। সুতরাং পৃথিবীর মত মঙ্গলেও ঋতুচক্র আছে।

অবশ্য যেহেতু মঙ্গলের এক বছর পৃথিবীর এক বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ লম্বা, সেখানে বিভিন্ন ঋতুর স্থিতিকালও অনেক বেশি।

পৃথিবী ও মঙ্গলের আহ্নিক গতিও প্রায় এক সমান। পৃথিবী নিজের অক্ষে ঘোরে 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4 সেকেণ্ড। সে তুলনায় মঙ্গল নিজের অক্ষে একবার পাক খায় 24 ঘণ্টা 37 মিনিট 23 সেকেণ্ড। এছাড়া পৃথিবীর মত মঙ্গলেরও নিজস্ব বায়ুমণ্ডল আছে যদিও তা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তুলনায় খুবই হাল্কা।

মঙ্গলগ্রহের বিষয় এ সব তথ্য অনেকদিন আগেই বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেখানে জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে সে ধারণা মানুষের মনে আসে গত শতাব্দীর শেষের দিকে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, ঐ ধারণার মূলে কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য ছিল না। ওটার উৎপত্তি হয় কেবলমাত্র একটা ভাষাগত ভুল থেকে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকেই জানতেন যে আকাশে মঙ্গলের ঔজ্জ্বল্য যথেষ্ট কমে বাড়ে। ওটা হয় কক্ষপথে চলার সময় পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যেকার দূরত্বের কম বেশী হওয়ার দরুণ। দেখা গেছে যে প্রতি 15 থেকে 17 বছর পর পর একবার মঙ্গল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে চলে আসে যখন তাকে সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল দেখায়। সে সময় পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় মাত্র 5 কোটি 60 লক্ষ কিলোমিটার। সে সময় দূরবীনে মঙ্গলের অনেক বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসেও মঙ্গল পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে এসেছিল বলেই তাকে অত উজ্জ্বল দেখাতো। সে সময় বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং সাধারণ মানুষ দূরবীণে গ্রহটিকে দেখার সুযোগ পেয়েছিল।

বিগত 1877 সালের আগস্ট মাসেও মঙ্গল এসেছিল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে। ঐ দূরবীণ দিয়ে গ্রহটিকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে এক অদ্ভুত জিনিষ লক্ষ করলেন ইতালীয় বিজ্ঞানী গিওভানি সিয়াপারেলি। তাঁর চোখে পড়ল মঙ্গলের গায়ে মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম রেখা। সরল রেখার মত ঐ দাগগুলির তিনি নাম দিলেন Canali, ইতালীয় ভাষায় যার মানে 'খাঁজ'। কিন্তু পরিবর্তিকালে ঐ canali-কেই বিজ্ঞানীরা ভুল করে canal বা খাল বলেই ধরে নিলেন।

এর পর 1894 সালে মার্কিন বিজ্ঞানী পার্সিভাল লোয়েল বললেন, যেহেতু মঙ্গলের 'খাল' গুলির গঠন সরল রেখার মত, সেগুলি নিশ্চয়ই কৃত্রিম ভাবে তৈরী। আর যদি সত্যিই তাই হয় তবে মঙ্গলে নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান জীব আছে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, canali শব্দটির ভুল ভাষান্তর থেকেই ঐ ভুল ধারণার উৎপত্তি।

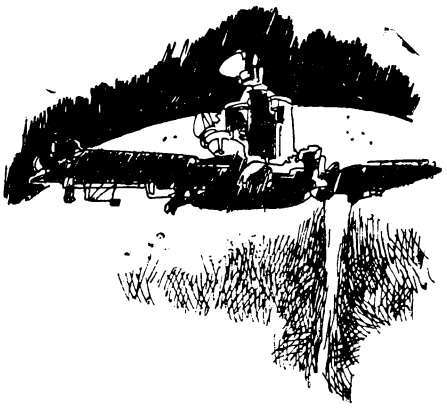

গত আড়াই দশকের মহাকাশ অভিযানের ফলে অবশ্য জানতে পারা গেছে মঙ্গলে কোনও খাল নেই এমনকি তরল জলও নেই। তবে সেখানে বিশাল মৃত আগ্নেয়গিরি এবং গভীর গিরিখাত আছে। সেখানকার মাটি মরুভূমির মত শুকনো বালি পাথরে ভরা। গ্রহযান থেকে তোলা ছবিতে দেখতে পাওয়া গেছে মঙ্গলের ওপর শুকিয়ে যাওয়া নদীর মত বহু আঁকা বাঁকা রেখা যাতে অতীতে কোনও সময়ে জল-প্রবাহের চিহ্ন পরিষ্কার চোখে পড়ে। অর্থাৎ সুদূর অতীতে নিশ্চয়ই সেখানে প্রচুর জল ছিল। আরও জানতে পারা গেছে যে মঙ্গলের মেরু অঞ্চলে যে সাদা 'টুপি' দেখতে পাওয়া যায় তার বেশির ভাগটাই জমাট বাঁধা কার্বন-ডাই-অক্সাইড যদিও তাতে সামান্য কিছুটা জলের বরফও আছে।

মঙ্গলের মাটি নিয়ে তাতে জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা সেটা প্রথম পরীক্ষা করে দেখা হয় 1976 সালে। সে বছর দু'টি 'ভাইকিং' গ্রহযান মঙ্গলের মাটিতে গিয়ে নামে এবং তাতে লাগানো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। দু'টি গ্রহযানেই মঙ্গলের উপরিতলের মাটি খুঁড়ে তাতে কোনও জৈব বিক্রিয়ার লক্ষণ আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি ছিল। কিন্তু অনেক রকম পরীক্ষা চালানোর পরও মঙ্গলের মাটিতে জীবনের কোনও লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তাহলে কি মঙ্গলে সত্যিই কোনও জীব নেই? হয়ত না, অন্ততঃ পৃথিবীতে যে ধরণের জীব বাস করে, যারা অক্সিজেন ও জল ছাড়া বাঁচতে পারে না, সে ধরণের কোনও জীব হয়তো মঙ্গলে নেই। তাছাড়া, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তর না থাকার দরুণ মঙ্গলের উপরিতলে যে প্রচণ্ড পরিমাণ অতিবেগুনি রশ্মি সূর্য থেকে এসে পড়ে তার প্রভাবে কোনও জীবের সেখানে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

ফোবোস উপগ্রহ

আজ পর্যন্ত যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে মঙ্গলে কোনও বুদ্ধিমান জীবের বাস নেই। তবে এমনও হতে পারে যে মঙ্গলের লাল মাটির নিচে হয়ত জল আছে এবং আদিম এককোষী উদ্ভিদ বা জীবাণুও আছে। কিন্তু বাস্তবে যদি এধরণের কিছু থাকে তাহলে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানবার কোনও উপায় আজ আমাদের কাছে নেই। ভবিষ্যতে যদি মানুষ মঙ্গলের মাটিতে গিয়ে নামে তখন হয়ত এ বিষয় সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানে মানুষ নামাবার আগে অনেক তোড়জোড় দরকার। নামার উপযুক্ত স্থান বাছাই করা, সেখানকার আবহাওয়া ভাল করে বুঝে নেওয়া ইত্যাদির প্রয়োজন। বর্তমান 'ফোবোস' অভিযানের এক প্রধান উদ্দেশ্য হল এসব বিষয় নিয়ে পর্যবেক্ষণ চালানো এবং তথ্য সংগ্রহ করা।

অভিযানের প্রথম ধাপে পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহ পর্যন্ত যাওয়ার পথে গ্রহযানটি সূর্য ও সৌর ঝড় সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করবে। তারপর মঙ্গল গ্রহের কাছে পৌঁছে সেটি প্রথমে তার বায়ুমণ্ডল, উপরিতল এবং চৌম্বকক্ষেত্র সম্পর্কে নানা রকম পর্যবেক্ষণ চালাবে। প্রায় একমাস ধরে এভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর 'ফোবোস' যানটিকে মঙ্গলের চারপাশে এমন একটি কক্ষপথে নিয়ে যাওয়া হবে যেখান থেকে গ্রহ-যানটি মঙ্গলের কাছের উপগ্রহ ফোবোস-এর উপরিতল থেকে মাত্র 40—60 মিটার দূরত্বের মধ্যে নেমে আসবে। এবার একটি ছোট রোবাট যানকে ফোবোস উপগ্রহের ওপর নামানো হবে। স্প্রিং যুক্ত ঐ অদ্ভুত যানটি উপগ্রহের মাটির ওপর বিভিন্ন জায়গায় লাফিয়ে বেড়াবে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে। কক্ষপথে মূল গ্রহযানটি থেকেও শক্তিশালী লেসার রশ্মির সাহায্যে ফোবোস উপগ্রহের মাটি পরীক্ষা করে দেখা হবে তাতে কি কি উপাদান আছে।

মাত্র 22 কিলোমিটার লম্বা এবং 16 কিলোমিটার চওড়া ফোবোস উপগ্রহটিকে নিয়ে এত কৌতূহলের একটা কারণ আছে। কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করেন যে ফোবোস আসলে একটি গ্রহাণু। হয়ত অতীতে কোনও সময়ে মঙ্গলের খুব কাছে এসে পড়ার ফলেই এটি মঙ্গলের টানে আটকে পড়েছে। যদি তাই হয় তবে ফোবোসের মাটিতে সৌর-মণ্ডলের সৃষ্টির প্রাচীনতম উপাদানের হদিশ পাওয়া যেতে পারে। ফোবোসে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ও নাইট্রোজেন আছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। যদি বর্তমান ফোবোস অভিযানের ফলে তা প্রমাণিত হয় তবে ভবিষ্যতে মঙ্গল অভিযান হয়ত আরও সহজ হয়ে যাবে, কারণ ফোবোসের ঐ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনই মঙ্গলগ্রহ গামী মহাকাশযানগুলির জন্য জ্বালানী জোগাবে।

ফোবোস অভিযানের ফলে যে সব মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে তা ভবিষ্যতে মঙ্গলগ্রহে মানুষ পাঠানোর কাজে যথেষ্ট সাহায্য করবে। বর্তমানে যে সব কার্যসূচী তৈরী করা হয়েছে সেগুলি যদি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তাহলে হয়ত আগামী 2010 সালের মধ্যে রাশিয়া ও আমেরিকার যুগ্ম অভিযান প্রথম মানুষকে মঙ্গলের লাল মাটিতে নামিয়ে দেবে।

7uF কলেজ রোড, নিউদিল্লী-1

পনেরো

এর পরের কাহিনী অবশ্য সংক্ষিপ্ত। খানিকটা এগোতেই আমাদের সঙ্গে মোলাকাৎ হলো পুলিশ বোটের। পুলিশ বোট থেকে একজন অফিসার আমাদের জাহাজে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন। দেখলাম, অফিসারটি আর কেউ নন, জাহাজে যার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল, সেই মিঃ তলাপাত্র।

কাকার ভুরুজোড়া সরলরেখা হয়ে উঠল, 'আপনি! অথচ আপনাকে—'

'আমাকে নিশ্চয়ই সবসময় ডাকাত দলের সরদার ভেবে এসেছেন। তাই না!' মিঃ তলাপাত্র হেসে উঠলেন হা হা করে।

'কিন্তু আপনি তো একটু দেরি করে এসেছেন। একটা সুন্দর দৃশ্য দেখতে পেলেন না।' আমার কথা বলার ভঙ্গীতে সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

মিঃ তলাপাত্র দমবার নন, বললেন, 'তা' পুলিশের লোক একটু দেরি করেই থাকে। তাতে ঘাবড়াবার কী আছে! যাক, ডঃ শ্রীবাস্তবকে উদ্ধার করেছেন তাহলে। আমরা যে কী দুশ্চিন্তায় ছিলাম কী বলব! তবে আপনাদের খবর আমরা সবসময়ই রাখছিলাম। ঐ যে দেখুন মাথার ওপরে হেলিকপটার।'

মিঃ তলাপাত্রর কথায় আমরা সবাই আকাশে তাকালাম। দেখলাম, সত্যিই হলুদ প্রজাপতির মতো একটা হেলিকপটার উড়ছে। সৃজনকাকা এবার শ্রীবাস্তবচাচার দিকে ফিরলেন, 'ডঃ শ্রীবাস্তব, এবার আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলুন। আমরা শুনি—'

ডঃ শ্রীবাস্তব শুরু করলেন, 'আপনারা সকলেই জানেন, আমি আন্দামানে এসেছি সরকারের তরফ থেকে পেট্রোলিয়ামের খোঁজে। অবশ্য এই প্রথম নয়, এর আগেও প্রায় বছর পাঁচেক ধরেই এখানে এই কাজ করছি। তাই স্বাভাবিক কারণেই আমার কাছে আন্দামানের পেট্রোলিয়াম নিয়ে এমন সব তথ্য ও মানচিত্র রয়েছে, যা আর কারো কাছেই থাকা সম্ভব নয়।

একটু থেমে আবার শুরু করেন ডঃ শ্রীবাস্তব, 'আজকের যুগে পেট্রোলিয়াম সংকটের কথা আপনারা সবাই জানেন আর আমরাও এটা জানতাম, এসব দ্বীপে পেট্রোলিয়াম মিলবার সম্ভাবনা যথেষ্টই। তাই একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক এসব দ্বীপে কাজকর্ম চলছিল। কিন্তু গত বছর থেকে একটি আন্তর্জাতিক চক্রের নজর পড়ে এসব দ্বীপের ওপর। ওরা কোত্থেকে যেন জানতে পারে, এসব দ্বীপে হয়তো পেট্রোলিয়াম পাওয়া যেতে পারে। আপনারা হয়তো জানেন না, গত বছর আমাদের ক্যাম্প থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাপ হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার তা' খুঁজে পাওয়া যায়। এখন বুঝতে পারছি, ওইসব ম্যাপ এই চক্র থেকেই চুরি করা হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যাতে সরকারের দপ্তর পর্যন্ত না গড়ায় কিংবা কারো মনে সন্দেহ না হয়, তাই হয়তো ওরা ম্যাপের নকশা নকল করে ম্যাপগুলো আবার জায়গা মতো রেখে যায়। এবারও মিঃ বোসের কাছ থেকে বেশ কতগুলি ম্যাপ ওরা চুরি করেছে। ওর সেই ম্যাপগুলি আমি দেখেছি এই দ্বীপে—'

সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে উঠলাম, 'পারুবা দ্বীপে।'

ডঃ শ্রীবাস্তব আবার বলতে শুরু করলেন, 'পারুবা দ্বীপে ওদের কাজকর্ম অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল। আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই পেট্রোলিয়াম তোলবার কথা ছিল। আর সেই পেট্রোলিয়াম পেট্রোল ট্যাংকারে করে সিংগাপুরে পাচার করার ব্লুপ্রিন্টও রেডি। কিন্তু আচমকা ভূমিকম্পই ওদের জন্য সলিল সমাধি রচনা করল চিরকালের মতো। কিন্তু আমি বাঁচলাম। শুধুমাত্র আপনাদের জন্য—'

সৃজনকাকা আমার দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'এর

ধন্যি মশাই মিঃ বোস। আপনি যে ভারত সরকারের তরফ.....

জন্য, অনেকটা কৃতিত্বই কিন্তু আমার ভাইপো বাদলের। ও যদি দূরবীণে ঐ দ্বীপটা দেখতে না পেত, তাহলে তো ফিরেই যাচ্ছিলাম আমরা।'

সৃজনকাকার কথা শুনে সেই মুহূর্তে আমার চৌত্রিশ ইঞ্চির ছাতি ছত্রিশ ইঞ্চি হয়ে উঠেছিল। আমি কৃতজ্ঞ চোখে দেবরের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কিন্তু দেবরদা না থাকলে আমাদের এই অভিযান তো কিছুতেই সার্থক হতো না।'

সবাই সায় দিলেন আমার কথায়।

অবশ্য মিঃ তলাপাত্রই শেষ চমকটা দিলেন আমাদের। সৃজনকাকার দিকে নিজের হাতটা প্রসারিত করে বললেন, 'ধন্যি মশাই মিঃ বোস। আপনি যে ভারত সরকারের তরফ থেকে এ ব্যাপারে সিক্রেট এজেন্ট হয়ে এসেছেন, তাতো আগে বুঝতেই পারি নি।'

সৃজনকাকা চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে হাসলেন, 'আপনারা সবাই জানতে পারলে কী আর আপনাদের সঙ্গে এভাবে মোলাকাৎ হতো আমার! তার আগেই ডঃ শ্রীবাস্তবের মতো আমিও লোপাট হয়ে যেতাম। বলুন, ঠিক কিনা।'

আমি ও শংকরকাকা দুজনেই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম সৃজনকাকার দিকে। এত কাছের লোক হয়েও আমরা কখনো বুঝতে পারি নি সৃজনকাকা এক ভয়ংকর সিক্রেট এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন।

(শেষ)

B4/2 ঈশ্বরচন্দ্র নিবাস, 68/1 বাগমারী রোড,
কলিকাতা-700054।

বৃষ্টি তখন নামবে ধীরে

অনুবাদিকা / কে· সিকদার

ক্যালিফোর্নিয়ার একটা ছোট্ট সহর আনবিক বোমার আঘাতে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। চারিদিকে কেবল ভাঙ্গা ইঁট, কাঠ পাথর আর ছাই। রাতের বেলায় সমস্ত সহরটা রেডিও অ্যাকটিভ আলোয় জ্বল জ্বল করে— কয়েক মাইল দূর থেকেও তা' দেখা যায়।

সেই সহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাড়ি, একেবারে নিঃসঙ্গ। তার কয়েকটা ঘর কেমন করে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেছে। কাল পর্যন্ত এই বাড়িটা কত সজীব ছিল, লোকজন, দাস দাসীতে জমজমাট কত আনন্দ, কত কোলাহল। আজ এই বাড়ি যেন পরিত্যক্ত এক দেবালয়। দেবতার মূর্তি ভেঙ্গে গেছে। কেবল কতকগুলো মন্ত্র যথারীতি উচ্চারিত হচ্ছে। কতকগুলো অনুষ্ঠান যন্ত্রের মত পালিত হচ্ছে।

সেদিন ভোর বেলা। শোবার ঘরের দেওয়ালে বেজে উঠলো—'টিকটক-7টা বাজে। উঠে পড়, উঠে পড়।' কেউ বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলো না। আবার দেওয়ালে বেজে উঠলো—'7টা বাজে উঠে পড়, উঠে পড়। জল খাবারের সময় হ'ল।' এমনই ভাবে অনেকবার ডাকাডাকি আর অনুরোধ কয়ে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

রান্নাঘরে এই সময় আট টুকরো রুটি স্যাঁকা হচ্ছে। তার মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল। একটু পরে টেবিলে রুটির টুকরো-গুলো প্লেটে প্লেটে সাজানো হয়ে গেল। তায় সঙ্গে আটটা ডিম সেদ্ধ, আট টুকরো বেকন, দু' কাপ কফি দু' গ্লাস ঠাণ্ডা দুধ। রান্নাঘরের দেওয়ালে বেজে উঠলো—'আজ 4ঠা আগষ্ট, 2026 সাল। আজ মিঃ ফেদার স্টোনের জন্ম দিন, শ্রীমতী টিলিটার বিবাহ বার্ষিকী। আজ ইন্সিওরেন্সের টাকা, গ্যাস আর লাইটের বিল জমা দিতে হবে।' বার বার তিনবার এই কথাগুলো বলে দেওয়া হল।

'আটটা বাজে—টিক্ টক্ আটটা বাজে। স্কুলে যাও, স্কুলে যাও।' কথাগুলো শূন্যঘরের মধ্যে ভেসে বেড়াতে লাগলো কিন্তু দরজা খুললো না। ছোট ছোট জুতো পরা পায়ের দ্রুত চলার শব্দও শোনা গেল না। বইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে। সামনের দরজা থেকে বলে উঠলো—'ও বৃষ্টি থেমে যা। ও বৃষ্টি থেমে যা। বর্ষাতি নাও আর রবারের জুতো পরে বাইরে যাও।' বৃষ্টির শব্দ আর এই কথাগুলো ফাঁকা ঘরে প্রতিধ্বনি তু'লে ঘুয়ে বেড়াতে লাগলো।

বাইরে গ্যারেজে দরজা খুলে গেছে। গাড়ী প্রস্তুত। কিন্তু কেউ এল না গাড়ী চড়ে স্কুলে যেতে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে গ্যারেজের দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সাড়ে আটটার সময় খাবার টেবিলে ডিমগুলো শুকিয়ে উঠলো। রুটির টুকরোগুলো পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। একটা হাতা এসে সব জিনিষগুলো পাশের সিঙ্কে ফেলে দিল। টেবিল পরিস্কার হয়ে গেল। সিঙ্কের মধ্যে সেগুলো গরম জলে গলে মোটা নলের মধ্য দিয়ে সোজা সমুদ্রে গিয়ে পড়লো। পাত্রগুলোও গরম জলে ধুয়ে মুছে ঝক্‌ঝকে করে আবার ঠিক জায়গায় রাখা হল।

'নটা পনেরো—ঘর দোর সাফ কর—' দেওয়ালে আদেশ ভেসে উঠলো। অমনি দলে দলে যন্ত্রের ইঁদুর বেরিয়ে এল দেওয়ালের আস্তানা থেকে। তারপর দ্রুত পায়ে মেঝের উপর ঘুরে ঘুরে, টেবিল চেয়ারের তলা থেকে, কার্পেটের নীচ থেকে ধুলো বালি শুষে নিল। তাদের লাল চোখ বৈদ্যুতিক আলোয় ঝক্ ঝক্ করে। কাজ শেষ করে আবার তাঁরা দেওয়ালের মধ্যে চক্ষের পলকে মিলিয়ে গেল।

দশটা বাজে। বৃষ্টি থেমেছে। মেঘের আড়াল থেকে সূর্যের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। দশটা বেজে

পনেরো। বাগানের ধারা যন্ত্রগুলো কাজ করতে আরম্ভ করলো। জানলা দরজার কাঁচ জলের ধারায় পরিষ্কার হয়ে ধুয়ে গেল। বাড়ির পশ্চিম দিকটা সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে। সেখানে দেওয়ালের রংটা জ্বলে গিয়ে কালো হয়ে আছে। তারই গায়ে জ্বল জ্বলে আলোয় আঁকা হয়ে আছে ক'টা মূর্তি। একটি পুরুষ প্রাঙ্গনের ঘাস যন্ত্র দিয়ে কাটছে, একটি নারী বাগানে ফুল তুলতে নত হয়ে আছে। আকাশে বল ছুঁড়ছে একটি বালক, আর বালিকাটি তা ধরবার জন্যে শূন্যে হাত দুটো তুলে রেখেছে। এই বাড়ির সুখী পরিবারের ছবিটি চিরকালের জন্যে ভাস্বর হয়ে রয়েছে দেওয়ালের কালো রংয়ের পট-ভূমিতে।

দু' একটা কুকুর, বেড়াল কোনরকমে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রেহাই পেয়েছে। তাদের অস্পষ্ট পায়ের শব্দে, গাছের অবশিষ্ট দু' একটা পাতা ঝরার কম্পনে বাইরের দরজা সতর্ক কণ্ঠ বলে ওঠে-'কে যায়; কাকে চাই, কোড নাম্বার কত?' কোন উত্তর আসে না। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা শত্রুর কথা ভেবে সাবধান হয়ে যায়। দরজা জানলার খড়খড়ি নেমে আসে চারিদিক বন্ধ হয়ে যায়।

বারোটা বাজে। রুগ্ন শীর্ণ কুকুরটা বাইরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কুঁই কুঁই করে ডাকে। এই পরিচিত শব্দে দরজা খুলে যায়। ও ঘরে ঢুকে সোজা খাবার টেবিলের কাছে শুয়ে পড়ে। তার পায়ে পায়ে ধুলো, বালি ঘরের কার্পেটের উপর ছড়িয়ে পড়ে। অমনি ইঁদুরগুলো বিরক্ত হয়ে দেওয়ালের আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসে আর ধুলো, বালি মুঠো করে একটা নলের মধ্যে ফেলে দেয়। সেখান থেকে সেই আবর্জনা মাটির নীচের ঘরে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়ে আর কয়েক মুহূর্তেই ভস্মরাশিতে পরিণত হয়।

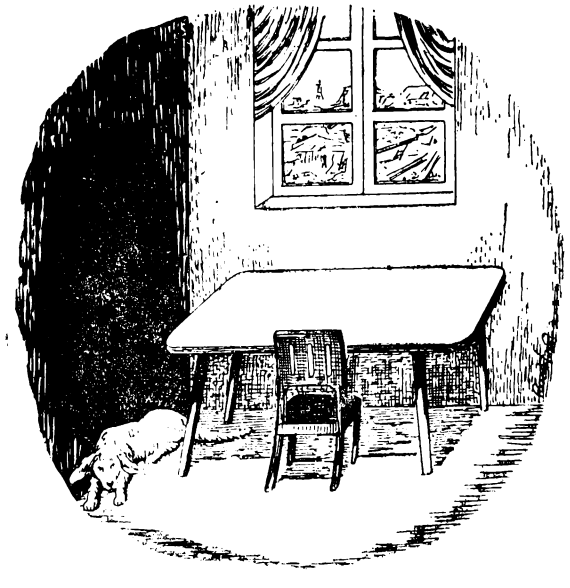

শীর্ণ কুকুরটা কুঁই কুঁই করে ডাকে…

কুকুরটাকে খাবার ঘরে কেউ কিছু খেতে দিল না। সে তখন কাঁদতে কাঁদতে দোতলার ঘরগুলো ঘুরে এল। কেউ কোথাও নেই। ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে সে আবার খাবার ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়লো আর উঠতে পারলো না।

দু'টো বেজে পনেরো মিনিট। মৃত্যুর গন্ধ পেয়ে ইঁদুরের দল আবার বেরিয়ে এল দেওয়াল থেকে আর পনেরো মিনিটেই মৃত কুকুরের দেহটা তিলে তিলে ছিন্ন করে লোহার নলের মধ্যে ফেলে দিল। দেহাবশেষ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নীচের ঘরের অগ্নিকুণ্ড গন্ গন্ করে জ্বলে উঠলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে সব শেষ। আগুনের কিছু ফুলকি চিমনি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

'দু'টো বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট—গেয়ে উঠলো যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। বারান্দার দেওয়াল থেকে তাস খেলার টেবিল বেরিয়ে এল—তাস সাজানো হল। মৃদুস্বরে বাজনা বাজতে লাগলো। কেউ এসে টেবিলে বসলো না। তাসগুলো যেমন সাজানো ছিল তেমনই পড়ে রইলো। চারটে বাজলো। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলটা তাস সমেত ভাঁজ হয়ে আবার দেওয়ালের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

সাড়ে চারটে। ছেলে মেয়েদের এখন খেলার সময়। নার্সারীর দেওয়ালে দেওয়ালে আলো জ্বলে উঠলো। তার মধ্যে হলুদ রং-এর জিরাফ নীল সিংহ গোলাপী রং-এর হরিণ বাদামী রং-এর চিতা বাঘের মূর্তি ভেসে বেড়াতে লাগলো। মেঝেটা নরম নরম ঘাসে ছেয়ে গেল তার থেকে নানারকম পতঙ্গ লাফাতে লাগলো। লাল রং-এর পাখা মেলে প্রজাপতি উড়তে আরম্ভ করলো নার্সারী ঘরের কৃত্রিম আকাশে। কোথায় যেন একটা বিরাট মৌচাক গড়ে উঠলো—তাতে অসংখ্য মৌমাছির গুঞ্জন। মাঝে মাঝে বনের মধ্যে বৃষ্টি ঝরার শব্দও ভেসে এল।

পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে স্নানের ঘরে চৌবাচ্চাটা স্বচ্ছ, টলটলে গরম জলে ভরে গেল। কিন্তু কেউ সেই সুগন্ধি জলে গা ভাসিয়ে দিল না।

ছটা, সাতটা, আটটা বাজে। খাবার টেবিলে থরে থরে খাবার সাজানো হল। একটু পরে লাইব্রেরী ঘরে 'ফায়ার প্লেসের' সামনে দেওয়াল থেকে জ্বলন্ত সিগারেট বেরিয়ে এল। তার মাথায় আধ ইঞ্চি পোড়া ছাই। মিষ্টি তামাকের গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সিগারেটটা নিভে গেল।

নটা বাজলো। রাতটা বেশ ঠাণ্ডা। বিছানার তলার

বৈদ্যুতিক তারগুলো সজীব হয়ে বিছানা গুলোকে গরম করে দিল।

নটা বেজে পাঁচ মিনিট। লাইব্রেরী ঘরের ছাত থেকে মিষ্টি নারী কণ্ঠ বেজে উঠলো 'মিসেস ম্যাক্‌কেলান, আজ কোন কবিতাটা শুনবেন?' কোন উত্তর নেই—সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। নারীকণ্ঠ আবার বলে উঠলো—'আপনি যখন কিছু বললেন না, তখন আমি যে কবিতাটি সামনে রয়েছে, সেটাই পড়ছি। সারা টিয়াসডেলের কবিতা-আপনি তো ওঁর কবিতা খুব ভালবাসেন।'

কবিতা পড়া আরম্ভ হল। সঙ্গে মৃদু বাজনার শব্দ।

'বৃষ্টি তখন নামবে ধীরে, বেড়ার তারে বসে যে তার
উঠবে মাটির গন্ধ, আকুল গান গাওয়া॥
সোয়ালোটি উড়বে ঘুরে, জানবে না কেউ যুদ্ধ কেমন,
চঞ্চল তার ছন্দ॥ কি তার উদ্দেশ,
জলায় ব্যাঙ ধরবে যে গান, গাছ, পাখী, ফুল, জানবে না কেউ
রাত হবে নিঝুম। কখন হলাম শেষ॥
কুল গাছটি ছেয়ে যাবে বসন্ত সে আসবে যখন
সাদা ফুলের চুম॥ সেই সে প্রভাতেই,
রবিন পাখীর গায়ে যেন ভাবতে সে তো পারবে না কো
আগুন পালক ছাওয়া, আমরা যে আর নেই॥

ফায়ার প্লেসের আগুন জ্বলে জ্বলে নিভে গেল। খালি চেয়ার দুটো মুখোমুখি বসেই থাকলো। চারিদিক থমথমে নিস্তব্ধ কেবল মিষ্টি বাজনার শব্দটা ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে।

রাত দশটা। বাইরে ঝড় উঠেছে। হঠাৎ গাছের একটা ডাল ভেঙ্গে রান্নাঘরের কাঁচের জানলার ওপর আছড়ে পড়লো। কাঁচ ভেঙ্গে ছিটিয়ে গেল চারিদিকে। তাকে রাখা স্পিরিটের বোতল জ্বলন্ত ষ্টোভের ওপর ছিটকে পড়লো। আগুন জ্বলে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

অমনি ঘরে ঘরে 'আগুন, আগুন' বলে চীৎকার আরম্ভ হল। বাড়ীর সব আলো গুলো জ্বলে উঠলো। ছাদ থেকে জলের ধারা ঝরতে লাগলো। বোতলের সেই তরল স্পিরিট জ্বলতে জ্বলতে কার্পেটের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল। আগুন ছড়িয়ে পড়লো সব ঘরে। চারিদিকে কেবল যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর চীৎকার করছে 'আগুন, আগুন, বাঁচাও, বাঁচাও।'

বাড়িটা যেন নিজেকে বাঁচাবার জন্যে শত চেষ্টা আরম্ভ করলো। দরজা, জানলার কাঁচগুলো খুব শক্ত হয়ে বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আগুনের প্রচণ্ড তাপে ফ্রেমগুলো গলে গিয়ে ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। বাতাস গরম হয়ে আগুনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছড়িয়ে যায় আগুন বাতাসের ছোঁওয়ায় আরো বেড়ে যায়। যন্ত্রের ইঁদুর দলে দলে ছুটো-ছুটি করে কুলকুচো করে জল ছুঁড়তে লাগলো। দেওয়াল থেকেও জলের ধারা বৃষ্টির মত ঝরতে লাগলো।

হঠাৎ একটা জল তোলা পাম্প থেমে গেল। অমনি ছাত থেকে, দেওয়াল থেকে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হল। ছাদের ওপরে জলাধারের জল ফুরিয়ে গেল।

আগুন এবার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠেছে। ঘরে ঘরে শিখাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেওয়ালে টাঙ্গানো বিখ্যাত চিত্রকরদের ছবিগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল। জানালা, দরজা আসবাব-পত্র সব ভস্মস্যাৎ।

আগুন তিনতলায় উঠলো। বাড়ির সব কলকব্জার কেন্দ্র এখানে। নানা যন্ত্র চারিদিকে নিপুন হাতে সাজানো। তাই আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে নতুন নতুন অস্ত্র কাজে নামলো। যন্ত্র দানবেরা আগুন নেভাতে নানা রাসায়নিক তরল পদার্থ ছুঁড়তে লাগলো আগুনের দিকে। মেঝের উপর দিয়ে সেই তরল পদার্থ সাপের মত এঁকে বেঁকে ঘুরতে লাগলো। আগুন খানিকটা স্তিমিত হয়ে পড়লো। কিন্তু আগুনে দগ্ধ হয়ে অনেক কল কব্জা বিকল হয়ে গেছে। চারিদিকে কেবল কাঠ ফাঠার আর কাঁচ ভেঙ্গে পড়ার শব্দ। আর সব কিছুকে ঢেকে দিচ্ছে ধোঁয়ার আস্তরণ। যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর একভাবে চীৎকার করে যাচ্ছে—'বাঁচাও। বাঁচাও! আগুন, আগুন!' বিদ্যুতের তারগুলো পুড়ে যাচ্ছে আর একটার পর একটা কণ্ঠস্বর নীরব হয়ে যাচ্ছে।

নার্সারীতে লণ্ডভণ্ড অবস্থা। গোলাপী হরিণ, নীল সিংহ, হলুদ জিরাফ পাগলের মত লাফালাফি করছে। লাল প্রজাপতির পাখা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মেঝের নকল ঘাসের আস্তরণ পুড়ে কুঁকড়ে গেল চারিদিকে আগুনের এই তাণ্ডব লীলা। তার মধ্যে একটা মিষ্টি কণ্ঠস্বর কবিতা পড়ে যাচ্ছে আগুন এখনও সেখানে প্রবেশ করে নি।

সমস্ত বাড়িটা জ্বলছে। তিনতলা ভেঙ্গে পড়ছে দোতলার ওপর, দোতলা ভেঙ্গে পড়ছে নীচের তলায়। আধুনিক মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দের উপকরণস্বরূপ যা কিছু যন্ত্র ছিল, সবই ধীরে ধীরে স্তব্ধ, অচল হয়ে গেল।

পরদিন সকালে সূর্য উঠলো। অগ্নিদগ্ধ ধ্বংসস্তূপের উপর তার সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়লো। বাড়িটার একটা দেওয়াল তখনও কেমন করে বেঁচে আছে। সেখানে আপন মনে বেজে চলেছে একটি কণ্ঠস্বর—'আজ 5ই আগষ্ট, 2026 সাল, আজ 5ই আগষ্ট 2026 সাল, আজ 5ই আগষ্ট...।'

Ray Bradbury-এর বিজ্ঞানভিত্তিক ছোট গল্প 'There will come soft rains এর বঙ্গানুবাদ।

37 সুজনবাগান, পোঃ চুঁচুড়া 712101

মেদরহস্য

দেবব্রত রায়

ইংরেজীতে যেটা Obesity বাংলায় সেটা মেদবাহুল্য। চিকিৎসা শাস্ত্র মতে কোনো পুরুষের মোট ওজনের 20% র উপর এবং কোনো স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে যদি সেটা হয় 25% র বেশী শরীরের চর্বিজাতীয় পদার্থ থেকে তবেই তাঁদের আক্ষরিক অর্থে মেদবহুলদের দলে ফেলা যায়—অন্যথায় নয়। প্রাসঙ্গিকভাবে বলতেই হয় স্বাভাবিক ক্ষেত্রে শরীরের ওজনের পুরুষের ক্ষেত্রে 12-18% এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে 18-24% হয়ে থাকে চর্বির জন্য।

এবার ব্যাপারটার গভীরে ঢোকার চেষ্টা করা যাক—

আমাদের দেহে চর্বিকোষ (Fat cell) বলে একধরনের কোষে চর্বি জমা থাকে। এই কোষগুলির সংখ্যা যত বেশি হবে কিংবা তাদের সংখ্যা যত বাড়বে সমানুপাতিক হারে বেড়ে যাবে obesity-র পরিমাণ। এই দিকে নজর রেখে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা দু'ভাগে ভাগ করেছেন ব্যাপারটাকে। প্রথম শ্রেণীকে বলে Hyperplastic Obesity—এতে ফ্যাট সেলের সংখ্যাই বাড়ে সেলের মধ্যকার সঞ্চিত ফ্যাটের পরিমাণের বিশেষ কোনো তারতম্য হয় না। আরেক ধরণের হলো Hypertrophic obesity—এতে ঠিক উল্টোটা ঘটে। অর্থাৎ এতে প্রতিটি কোষে সঞ্চিত ফ্যাটের পরিমাণ বাড়লেই মোট কোষ সংখ্যা নির্দিষ্ট। এই দুটোকে একসঙ্গে নিয়ে আরেক ধরণের obesity-র কথা বলা হয়ে থাকে—Hypertrophic Hyperplastic type of obesity.

আমাদের প্রতিদিনের খাবার থেকে যে শক্তি আসে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা' যেমন ব্যয়িত হয় কায়িক শ্রমের জন্য (যেমন—হাঁটা, চলা, দৌড়ানো, মোট বওয়া) তেমনি শরীরের অভ্যন্তরীন যন্ত্রপাতির সর্বমানের সুসংগত কাজের জন্যও। দু'মুখ চৌবাচ্চার কথা মনে করা যাক। একটা নল দিয়ে জল ঢুকছে (বলা যাক Input) অন্যটা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে (বলা যাক Output)। খুব সাধারণ কথা Input যদি Output-এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে চৌবাচ্চায় জল জমা হতে থাকবে। আমাদের শরীরেও তেমনি দু'নল চৌবাচ্চার মত ব্যবস্থা আছে। গাদা গাদা খাবার খেলে (পরোক্ষে শক্তি গ্রহণ করলে) সবটাই তো আর Output হিসেবে খরচ হবে না। দেহের মধ্যে জমা হতে থাকবে—প্রধানতঃ এই ফ্যাট সেল গুলোর মধ্যে চর্বি আকারে। পরিনামে হবে obesity বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন প্রতি 9·3 কিলো ক্যালরি অতিরিক্ত শক্তির জন্য শরীরে ফ্যাটের পরিমাণ বাড়তে পারে 1 গ্রাম। সাধারণভাবে আমাদের শরীরের মোট Energy out of put-এর এক-তৃতীয়াংশ যায় পেশীর কাজে। এ জন্যই বাস্তবে দেখা যায় পেশীখাটিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাদের শরীরে চর্বির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

এবারে দেখা যাক আমাদের এই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা কে নিয়ন্ত্রণ করে—আমাদের Brain-এ হাইপো-থ্যালামাস (Hypothalamus) বলে একটা অংশ আছে। সেখানে দুটো কেন্দ্র আছে—একটার নাম Feeding centre অন্যটা Satiety Centre 1953 সালে ডেলগাডো (Delgado) এবং (Anand) আনন্দ নামে দু'জন বিজ্ঞানী প্রথম এদের কথা বলেন। আমাদের খাবার-দাবারের মাত্রিক (Quantitative) দিকটা নিয়ন্ত্রণ করে এই দুটো কেন্দ্র। Feeding centre-কে উত্তেজিত করলে আমাদের খাদ্য গ্রহণের মাত্রাটা ভয়ানক বেড়ে যায়। বিড়ালের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই Feeding centre নষ্ট করে দিলে তাদের খাবার ইচ্ছেটাই যায় নষ্ট হয়ে।

অনেকে বলে থাকেন মোটা লোকেদের (যার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী মাত্রাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ) Feeding

Centre-এর গঠনগত কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে যার দরুন এদের খাবার প্রবৃত্তিটাই সাধারণের চেয়ে একটু আলাদা। প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা বলেন একদা মোটা ছিলেন কিন্তু বর্তমানে মেদ কমিয়ে ফেলেছেন (সে যে কোনো ভাবেই হোক না কেন) এমন লোকেদের খাবার প্রবণতাকে কিন্তু কমাতে পারেন নি—বাধ্য হয়ে কম খান বটে কিন্তু তাতে তৃপ্তি পান না। কারণ আসল দোষ তো রয়েছে Brain-এ তাকে তো আর সারানো যায়নি।

একটা মজার ব্যাপার হলো দেহে খুব কম বয়সে Fat cell-এর যা সংখ্যা বয়সানুপাতে বেশি বয়সে তার সংখ্যা তেমন বেশি নয়। বাচ্চারা যদ্দিন মায়ের দুধ খায় তদ্দিন Fat Cell-এর সংখ্যা বাড়তে থাকে খুব তাড়াতাড়ি। মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করলে আপনা থেকেই এই মাত্রা কমতে থাকে বয়ঃসন্ধি কাল পর্যন্ত। তারপর খুব একটা সংখ্যায় বাড়ে না। তবু মাঝ বয়স থেকেই দেহে চর্বি জমতে শুরু করে। আগেই বলছি—Hypertrophy অর্থাৎ Fat Cell-এ সময়েই আস্তে আস্তে চর্বি জমতে শুরু করে, আর কোষের আয়তনও বাড়তে থাকে সমানুপাতে।

এতক্ষণ যা' বলা হলো তা' হলো খাবারের সঙ্গে obesity-র সম্পর্ক। এ ছাড়াও রয়েছে হরমোন ঘটিত কিছু সম্পর্ক ঃ

Adrenal gland বলে মানুষের কিডনীর উপরে দুটো খুব ছোট গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থিগুলোর বাইরের অংশ Cortex থেকে Cortisol নামে এক ধরনের হরমোন ক্ষরিত হয়। এই গ্রন্থির অধিক ক্ষরণে বিশেষ কয়েকটি জায়গায় (বুক, গলা প্রভৃতি) চর্বি জমতে শুরু করে।

Thyroid gland থাকে গলার কাছে যা থেকে Thyroxin হরমোন বেরোয়। কোনো কারণে যখন এই হরমোনের নিঃসরণ কমে যায় যেমন Cretinism,—ক্রেটিনিজম, Myxoedema মিক্সিডিমা) তখনও obesity আসতে পারে।

আবার যদি বয়ঃসন্ধির আগে কোনো পুরুষের শুক্রাশয় (Testis) নষ্ট হয়ে যায় বা তুলে নেওয়া যায় (ডাক্তারী ভাষায় Castration) তাহলেও একধরনের obesity দেখা যায়।

—এ রকম আরো অনেক আছে। তবে মুখ্যত অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলেই Obesity হয়ে থাকে। কিভাবে তা' আমরা আগেই জেনেছি।

উটের পিঠে কুঁজের বোঝা দেখে অনেকেই বলেছেন যে এতে নাকি প্রচুর চর্বি সঞ্চিত থাকে আর তা' থেকে উট প্রয়োজন মাফিক জল তৈরি করে মরুভূমির শুষ্ক পরিবেশেও দিব্যি জল ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে বেশ কয়েকদিন। মানুষের ক্ষেত্রে ঠিক এমন সুবিধাজনক ব্যাখ্যা কেউ না দিলেও এর ক্ষতির দিকটা কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে world Health Organisation (W H O) W H O-র মতে বর্তমান বিশ্বের যে কটা মারন রোগ রয়েছে তার প্রথম দিকেই রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension) এবং তা' থেকে উদ্ভূত একাধিক রোগ। আর এই রোগগুলোর সঙ্গে পরোক্ষ-ভাবে জড়িয়ে রয়েছে মেদবাহুল্য।

একটা প্রশ্ন মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক যে obesity বংশ পরম্পরার সংবাহিত হয় কিনা। লক্ষ্য করা গেছে বেশীর-ভাগ ক্ষেত্রেই বাবা-মা দু'জনেই মোটা হলে সন্তানেরও মোটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু একজন মোটা হলে সেই সম্ভাবনা যতটা কম দু'জনই স্লিম হ'লে সেই সম্ভাবনা আরো কম। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যমজ সন্তানকে (দুটোই ছেলে বা দুটোই মেয়ে) যদি একই ধরনের খাবার-দাবার খাইয়ে একই পরিবেশে রাখা যায় তবে তাদের মধ্যে ওজনের পার্থক্য কখনোই 1 কেজির বেশী হয় না। আবার তাদের আলাদা পরিবেশে রাখলেও পার্থক্য 2—$2\frac{1}{2}$ কেজির মধ্যেই থাকে। এসব দেখে অনেকেই obesity-কে বংশগত বলার পক্ষপাতি। অবশ্য এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট মতামত দেবার সময় এখনো আসেনি—কাজ চলছে।

মোটা হওয়ার ঝকমারি এখন অনেকেই বুঝে ফেলেছেন। তাই স্লিম হতেও চাইছেন অনেকেই। এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুরা প্রধানতঃ জোর দেন খাওয়ার দিকে। এ ধরনের রোগীদের তাঁরা এমন সব খাবার খেতে পরামর্শ দেন যাতে পেট ভরে (Feeding Centre-কে বশে রাখা যায়) অথচ তা' থেকে বিশেষ শক্তি আসে না। এই ধরনের Roughage জাতীয় খাবার খেয়েই অনেকটা স্লিম হওয়া যায়। বাজারেও এ ধরনের জিনিস যেমন কিনতে পাওয়া যায় তেমনি আমাদের হাতের কাছেও আছে অনেক জিনিস যেমন সাকসব্জী ইত্যাদি। অনেকেরই ধারণা আছে যে সাধারন খাবার-দাবারের পরে এই সব খাবার খেলেও চলে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভুল। মনে রাখতে হবে এটা কোনো ওষুধ নয়। ক্ষিধে কমানোর এ একটা উপায় মাত্র। তবে রাসায়নিক ওষুধপত্রও আছে। তবে তারা কাজ করে Brain-এর উপর খবরদারি করে। বহুদিন ধরে এইসব ওষুধপত্র খেলে অন্যান্য নানা ক্ষতিকারক উপসর্গ দেখা দেয় বলে একান্ত দরকার না পড়লে সাধারণতঃ চিকিৎসকেরা রোগীদের তা' খেতে বলেন না।

2, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা-37।

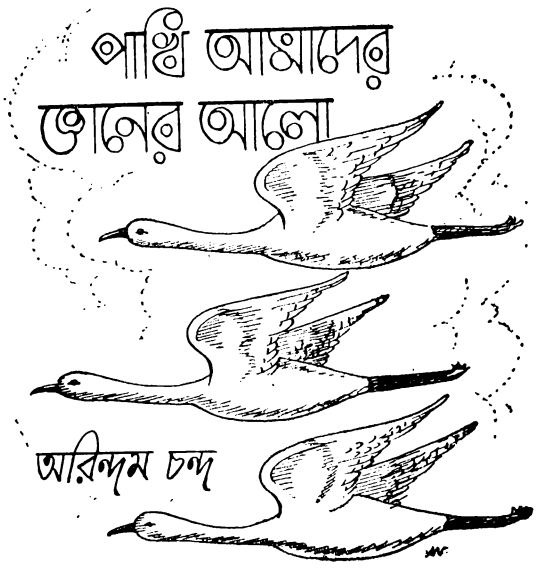

সুদূর অতীত থেকেই মানুষের কল্পনা, পাখির সাহায্যে বিস্তৃত হয়েছে। তারা দেখেছে যে পাখির দল হঠাৎ কোথা থেকে ঝাঁক বেঁধে আসে আবার নির্দিষ্ট সময়ে কোথায় চলে যায়। অনেকদিন পর্যন্ত পাখিদের যাওয়া-আসা সম্পর্কে মানুষের মনে জিজ্ঞাসা দানা বেঁধে উঠেছিল। সেইজন্য পৃথিবীর নানা স্থানে নানা বৈজ্ঞানিক-গবেষণা আরম্ভ হয়েছে। তবুও পাখিরা কেন যে ঝাঁক বেঁধে আসে বা নির্দিষ্ট সময়ে চলে যায় তা রয়ে গেছে এখনো রহস্যের গভীরে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে বরফের যুগে পাখিরা বাঁচার আশায় উত্তর গোলার্ধ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। আবার সব ঠিক হয়ে গেলে তারা নিজ নিজ জায়গায় চলে আসে। তবুও বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর মত যে পাখিরা দক্ষিণ গোলার্ধে বাস করে। কিন্তু এমন এক সময় আসে যখন দক্ষিণ গোলার্ধে পাখিদের চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য থাকে না, তখন তারা নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে বা পড়তে বাধ্য হয়। এরকম নানা মত বা সিদ্ধান্ত আমরা পেলেও পাখিদের অভিযান এখনো রহস্যের অন্তরালে থেকে গেছে। এছাড়া প্রত্যেক বছর পাখিরা অন্য স্থানে যাবার উৎসাহ যে কিরূপে পায় তা আজও আমাদের ঠিকভাবে জানা নেই। তবে এটা জানা গেছে, উত্তর গোলার্ধে যখন তারা থাকে, তখন তাদের প্রজণন গ্রন্থি সক্রিয় থাকে। ফলে তারা শীতবাস ত্যাগ করে অন্যত্র যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে।

পাখি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাদের দিক নির্ণয় ক্ষমতা। তারা সময় সময় হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে। তবুও তারা ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছায়। পাখিদের এই দিক নির্ণয় সম্পর্কে বহু বিজ্ঞানী গবেষণা শুরু করেছেন। 1882 ও 1946 এই দুই সালে, দুই বিজ্ঞানী যথাক্রমে ভিগি এবং ইয়েনগুলি এই বলে মত প্রকাশ করেন যে পৃথিবীর চৌম্বক শক্তির প্রাবল্যের মাত্রা অনুভব করে পাখিরা দেশান্তরে যায়। কিন্তু বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ এমলেনের মতে, রাত্রির ধ্রুবতারা ও অন্যান্য নক্ষত্রকে দেখে তারা পথ ঠিক করে। আবার আর একজন বিজ্ঞানী পাপি বলেন যে, পাখিরা তাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল নির্ণয় করে ঘ্রাণ নিয়ে। গোল্ডেন প্লেভার নামক এক প্রকার পাখি উত্তর আমেরিকার বালুকাময় মেরু অঞ্চলে ডিম পাড়ে। বাচ্চাদের বয়স প্রায় 1 মাসের মতো হলে, তারা চলে যায় সেই অঞ্চল ছেড়ে, এবং উপস্থিত হয় আর্জেনটিনার তৃণ অঞ্চলে। এদিকে সেই শিশু প্লেভারও কিছুটা বড় হয় এবং তারাও সেই তৃণ-ভূমির দিকে রওনা হয়। তবে আলাদা পথ দিয়ে। পরে সেই তৃণভূমিতে তারা মা-বাবার সঙ্গে মিলিত হয়ে, একত্রে অন্যত্র রওনা হয় সেখান থেকে। দুইজন খ্যাতিনামা বিজ্ঞানী ডঃ পিটগ্রিড, ও ডঃ প্রেসটি পায়রার গলার কাছে চৌম্বক পদার্থ ম্যাগনেটাইটের সন্ধান পেয়েছিলেন, যা দিক নির্ণয়ে

ভালভাবে সাহায্য করে। এর সাহায্যে পায়রারা দিক নির্ণয় করতে পারে অতি সহজেই এবং নির্ভুলভাবে সঠিক অবস্থান জানতে পারে। অনেক পাখি আছে যারা খুব উঁচু দিয়ে ওড়ে। সারস, বাজ, শকুন প্রভৃতি পাখি মাঝে মাঝে 29000 ফুট উঁচু দিয়ে ওড়ে বা উড়তে দেখা গেছে। এত উঁচুতে তারা অক্সিজেনের চাহিদা কেমন করে মেটায় তা

স্যালাসাইট কিং ফিসার

আজও মানুষের অজানা রয়ে গেছে। সাধারণতঃ পাখিদের গতিবেগ হয় 35—45 মাইল প্রতি ঘণ্টায়। কিন্তু কোথাও না থেমে, একটানা উড়ে চলার রেকর্ডও কোনো কোনো পাখির আছে। পূর্ব উল্লেখিত গোল্ডেন প্লেভার হচ্ছে ওইরকম একটা পাখি। যারা কোথাও না থেমে একটানা দেড় হাজার মাইল অতিক্রম করে। এছাড়া টাসমেনিয়ার মাটনবার্ড, প্রভৃতি পাখিরও এরকম একটানা উড়ে যাওয়ার রেকর্ড আছে। ভারতবর্ষে পাখির মোট প্রজাতি, মোট 1200টি। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই উড়ে আসে নানা প্রজাতির পাখি। যেমন, দিগহাঁস, পাতারি হাঁস, নীলশির হাঁস, লালশির হাঁস, বাসুলিয়া হাঁস, বুবিথ্রেট, গুপিগলা, অঞ্জনা, সখদাস্টার্ক, কাজল পাখি, রাওমুড়ি, পান্তামুখী, বড়দিঘর, তুলসীয়া, পোলবউ প্রভৃতি। কলকাতার বিখ্যাত জায়গা সল্টলেক যখন শহরে পরিণত হয় নি, তখন সেটি প্রায় 75টি প্রজাতির পাখির গ্রীষ্মবাস ছিল। কিন্তু কালক্রমে তারা সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। তবুও কিছু কিছু প্রজাতির পাখি এখনও কলকাতায় দেখা যায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের এখন পাখি শিকারের হুজুগ উঠেছে। সরকারের সে দিকে নজর দেওয়া উচিত। নয়তো কিছু কিছু দুর্লভ প্রজাতির পাখি শিকারের ফলে অবলুপ্ত হয়ে যাবে, নয় কি ?

আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

প্রকৃতি প্রেমিক অজয় হোম-এর

বাংলার পাখি

চেনা-অচেনা পাখি

বিচিত্র জীবজন্তু

পুর্ণমুদ্রণ চলছে ॥ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

মার্ক টোয়েনের 'এ কানেকটিকাট ইয়াংকি ইন কিং আর্থারস কোর্ট' অবলম্বনে

যুগের ভিতর যুগ

চিত্রনাট্য - অনিল কর্মকার
ছবি - গৌতম কর্মকার

আবার সেই ক্রীতদাসের দুর্বিসহ জীবন, হাতে হাতকড়া।
ওহ, ক্লারেন্সের নাইটরা যদি আমাকে চিনতে না পারে! পরিণতির কথা ভাবতেই পারছি না।
শুনেছো, আজ বিকেলে পনেরো জন দাসের ফাঁসি হবে। ঐ যে; তোমার পিছনে যারা রয়েছে।
সর্বনাশ! ওদের মধ্যে যে রাজাও আছেন।
কেন, ফাঁসি কেন?
শোননি? ওদের মধ্যে এক জন মালিকের চাবুক কেড়ে নিয়েছিল। তারপর খোদ মালিককেই উত্তম-মধ্যম মার। বাকি তেরোজন ওকে সাহায্য করেছিল।
তোমাকেও ওদের সঙ্গে ফাঁসি দেওয়া হবে।
বিকেল-- একের পর এক দাসের ফাঁসি হয়ে চলেছে। এবার পালা স্বয়ং রাজার--
সর্কেসর্বা, তুমি কোথায়?
নাহ, আর সহ্য করা যায় না। প্রাণ দিয়েও একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে।
কী করতে চাও তুমি?
এইয়ে, দেখাচ্ছি।
হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আমি জল্লাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম--
-দমাস-
-ওরেব্বা!-
34

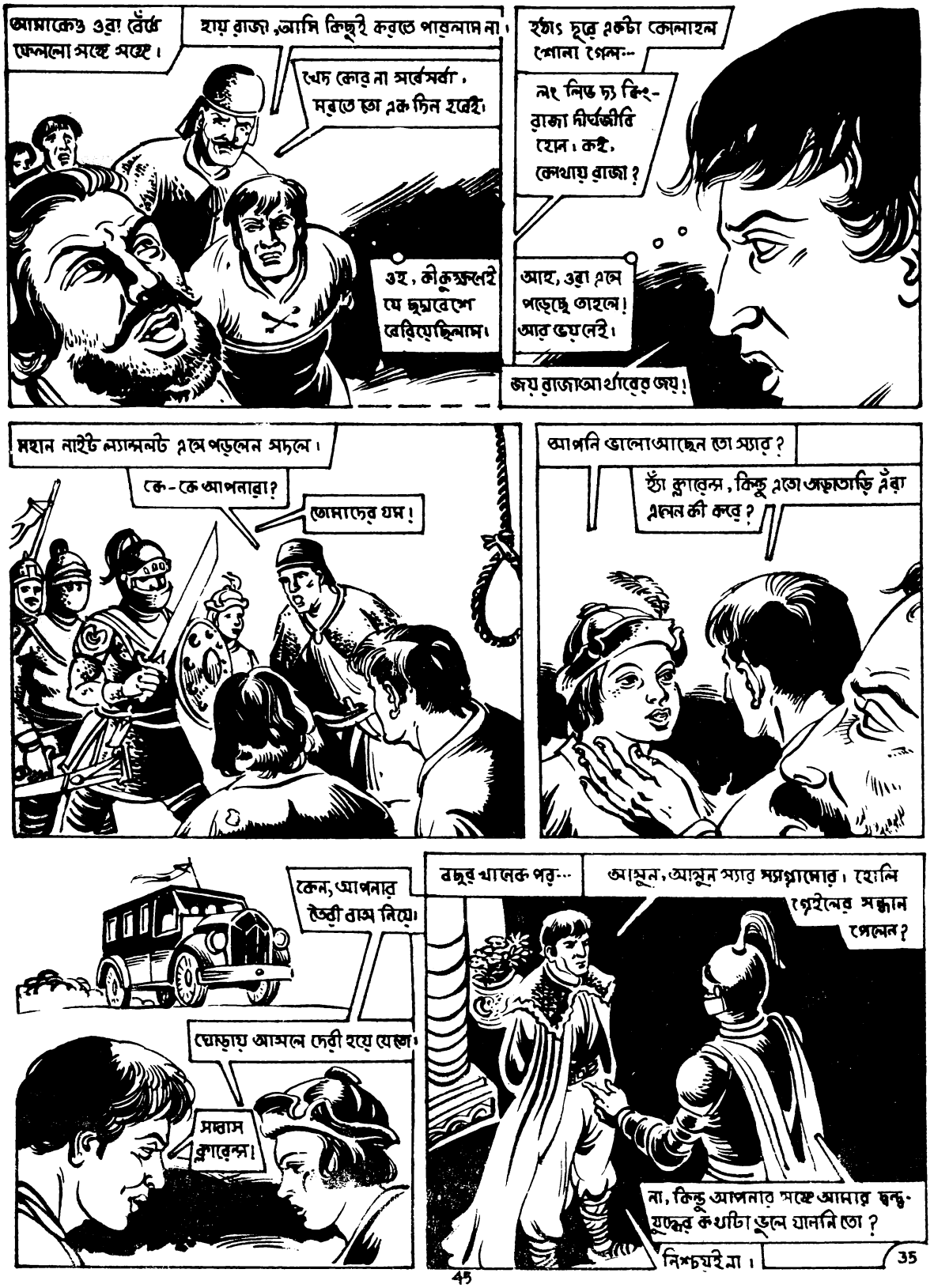

আমাকেও ওরা বেঁধে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে।
হায় রাজা, আমি কিছুই করতে পারলাম না।
খেদ কোর না সর্বেসর্বা, মরতে তো এক দিন হবেই।
ওহ, কী কুক্ষণেই যে ছদ্মবেশে বেরিয়েছিলাম।
হঠাৎ দূরে একটা কোলাহল শোনা গেল---
লং লিভ দ্য কিং- রাজা দীর্ঘজীবি হোন। কই, কোথায় রাজা?
আহ, ওরা এসে পড়েছে তাহলে! আর ভয় নেই।
জয় রাজাআর্থারের জয়!
মহান নাইট ল্যান্সলট এসে পড়লেন সদলে।
কে-কে আপনারা?
তোমাদের যম!
আপনি ভালো আছেন তো স্যার?
হ্যাঁ ক্লারেন্স, কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি এঁরা এলেন কী করে?
কেন, আপনার তৈরী বাস নিয়ে।
ঘোড়ায় আসলে দেরী হয়ে যেত।
সাবাস ক্লারেন্স!
বছর খানেক পর---
আসুন, আসুন স্যার স্যাগ্রামোর। হোলি গ্রেইলের সন্ধান পেলেন?
না, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের কথাটা ভুলে যাননি তো?
নিশ্চয়ই না।

এসে গেল নির্দিষ্ট দিন--
একি! সর্বেসর্বা, তোমার অস্ত্র কই?
এই দড়িই আমার যথেষ্ট।
নাইটদের এই ভুয়ো প্রতিপত্তি আজ নির্মূল করতে হবে। এই সামান্য ল্যাসোই এর জন্যে যথেষ্ট। আসুন স্যাগ্রামোর, আমি তৈরী।
এসে পড়লেন লর্ড স্যাগ্রামোর। আর আমিও ল্যাসোটা ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারলাম সামনে। তারপর হ্যাঁচকা এক টান---
মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন স্যাগ্রামোর..
..ঝনন ঝনাৎ..
..আহ..
জয় সর্বশক্তিমান হইয়ুমাকামাকের জয়!
এবার একের পর এক নাইট ছুটে এলেন সদর্পে, আর আমিও..
অষ্টম নাইটের পরাজয়ের পর আমি চমকে উঠে দেখলাম- আমার ল্যাসো মার্লিনের হাতে।
হি হি হি.. এবার কী হবে সর্বেসর্বা?
36

পুনরুক্তি না করে শুধু এই টুকুই বলা যায়, হয় মানুষ আর ভূতাত্ত্বিক গবেষণা সম্পর্কে আমাদের ধারণাই ভুল। আর না হয় জুতো-পরা কোনো দ্বিপদ অন্য গ্রহ থেকে এসে হাওয়া খেয়ে গেছে এই সবুজ গ্রহে।

সুইডেনের ন্যাশন্যাল ল্যাবোরেটরী অব ফোরেনসিক সায়ান্স রায় দিয়েছে, তুরস্কের গেডিজ নদীর দিকে ধাবমান পদচিহ্নের বয়স আড়াই লক্ষ বছর। আগ্নেয় ছাই-এর বয়স তাই। পদচিহ্ন যেন দৌড়েছে নদীর দিকে ছাই মাড়িয়ে। অগ্ন্যুৎপাত আসন্ন বলে?

নেভদার কার্সন সিটির কাছেও বালি পাথরে পাওয়া গেছে জুতোপরা বিশাল পদচিহ্ন—18 থেকে 20 ইঞ্চি লম্বা। বয়স? বিশ থেকে তিরিশ লক্ষ বছর।

অদ্ভুত আর অসম্ভব কঙ্কাল

মাথায় তার সিং ছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু ভুরুর ইঞ্চি কয়েক ওপরে সিং জাতীয় হাড় যে ঠেলে উঠেছিল, তার চিহ্ন দেখা গেছে কঙ্কালে। এ কঙ্কাল যার তার উচ্চতা সাত ফুট। 1200 খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তাকে কবর দেওয়া হয় পেনসিলভানিয়ার ব্র্যাডফোর্ড কাউন্টিতে। দুঃখের বিষয় ফিলাডেলফিয়ায় অবস্থিত আমেরিকান ইনভেসটিগেটিং মিউজিয়াম থেকে উধাও হয়েছে আশ্চর্য এই কঙ্কাল।

1837 সালে ওহিওতে পিগমি মানুষদের একটা কবর-খানা টনক নড়িয়ে ছাড়ে দেশ শুদ্ধ লোকের। কঙ্কালগুলো লম্বায় মোটে তিন থেকে চার ফুট। কাঠের কফিন এবং অন্যান্য জিনিসপত্র থেকে বোঝা গেছিল, এক সময়ে বড়সড় একটা শহরের বাসিন্দাই ছিল এই ক্ষুদে মানবরা।

এই ওহিও-তেই কবরখানা খুঁড়তে খুঁড়তে 1891 সালে পাওয়া গেল এক তামা মানুষের কঙ্কাল। তামা মানুষ এই অর্থে যে, তার পেল্লায় বপু পুরোপুরি ঢাকা তামা দিয়ে। মাথায় তামার টুপি, চোয়ালে তামার খাপ, বাহু-বুক-পেট মোড়া তামায়, মুখবিবর ভরাট অতিকায় কিন্তু ক্ষয়ে যাওয়া তামায়। পাশেই রয়েছে এক নারী-দানবের কঙ্কাল।

ইণ্ডিয়ানার কবরখানাতেও পাওয়া গেছে ন ফুট আট ইঞ্চি লম্বা কংকাল। আবার মিনেসোটার কবরখানায় যার কংকাল পাওয়া গেছে তার ওপরের আর নিচের চোয়ালে দাঁতের ডবল সারি। এ রকম দাঁড়ানো কংকাল একটা নয়, পাওয়া গেছে সাতটা—একই জায়গায়।

সবচেয়ে সাড়া জাগিয়েছে পেড্রোপাহাড়ের ম্যামী। বুদ্ধদেবের মত দু'হাত কোলে রেখে সে যেন ধ্যানস্থ। উচ্চতায় মোটে চোদ্দ ইঞ্চি। বৈজ্ঞানিকরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করেছেন তার বয়স—65 তো বটেই। অথচ হাইট মোটে চোদ্দ ইঞ্চি।

এক সময়ে এই পৃথিবীতে ক্ষুদে মানব ছিল কিনা, তা নিয়ে তার্কিকরা যা বলুন। মেক্সিকোর জ্যাপোটেক সভ্যতার রহস্য কিন্তু আজও রহস্যই রয়ে গেছে, স্পেনীয় আক্রমণের সময়ে জানা যায় জ্যাপোটেকরা খৃষ্টপূর্ব 200 সালে মেক্সিকোর দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে রাজত্ব করেছে। অতিশয় উন্নত কৃষ্টি আর সংস্কৃতির ধারক এই মানুষগুলোর উদ্ভব নাকি গাছ, পাথর আর জাগুয়ার থেকে—তাদেরই দাবী অনুযায়ী। পাহাড় চূড়োয় এদের রাজধানীতে দেখা গেছে আশ্চর্য এক পাতাল সুড়ঙ্গের গোলক ধাঁধা। নিখুঁতভাবে পাথর দিয়ে বাঁধানো প্রতিটি সুড়ঙ্গ এত সরু যে বাচ্চা ছাড়া কেউ তার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না। কোথায় বিশ ইঞ্চি উঁচু, কোথাও এক ফুট উঁচু। জহরৎ যেখানে পাওয়া গেছে, সেখানে রয়েছে ক্ষুদে ক্ষুদে ধাপের একটা কুঁচকে সিঁড়ি! পাতালরাজ্যের সুড়ঙ্গে সুড়ঙ্গে পড়ে কঙ্কাল! ধোঁয়া ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এই গোলকধাঁধায়—সুড়ঙ্গের মুখগুলো কোথায় আছে জানবার জন্যে। ধোঁয়া বেরিয়েছে 'অপ্রত্যাশিত অঞ্চল' দিয়ে।

গবেষকরা অনেক অনুমিতি খাড়া করেছিলেন সুড়ঙ্গরহস্য নিয়ে। কেউ বলেছেন, নোংরাজলের ড্রেন। কেউ বলেছেন, বিপদে চম্পট দেওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু কোনোটাই শেষ পর্যন্ত ধোপে টেঁকেনি। আজও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে জ্যাপোটেকদের পিগমি সুড়ঙ্গ। আজ যেখানে ওয়াক্সাকা শহর। সেখানে গেলেই মন্ট আলবান পাহাড়ের মাথায় দেখা যাবে এই বিস্ময়কে।

ভারতের বরোদা স্টেটের ভাদনগরেও পাওয়া গেছে পনেরো ইঞ্চি লম্বা মানুষের জীবাশ্ম একটা প্রাগৈতিহাসিক কুয়োর মধ্যে। পরে তা ধাপ্পাবাজি বলে উড়িয়ে দিলেও খবরটা যত্ন করে ছেপেছিল লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকা (21-2-35)। এই নিবন্ধেও তা সংকলিত হল এই কারণে যে ক্ষুদে মানুষরা যে এক সময়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছিল, তার ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখা যাচ্ছে—বিজ্ঞানীরা নাক সিঁটিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু কেন আধইঞ্চি, এমনকি সিকি ইঞ্চি লম্বা চকমকি পাথরের নিখুঁত যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে ইংল্যাণ্ডে, মিশরে, আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, ফ্রান্সে, সিসিলিতে এবং ইণ্ডিয়ার বিন্ধ্য পর্বতে—তার জবাব কে দেবে? এত ছোট যন্ত্র যারা ব্যবহার করেছে তাদের হাইট কত ছিল?

বিজ্ঞানীদের বাদানুবাদ

কার্ল স্যাগান নামটা সবার জানা। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ব্রহ্মাণ্ডে ধীমান জীব সম্পর্কে খান দুই কেতাব লিখেই বুদ্ধিজীবীদের টনক নড়িয়েছেন। অনেক হিসেব করে ইনি দেখিয়েছেন মহাকাশের দূর-দুরান্তে

বহুবার ধীমান জীবনের ক্রমবিবর্তন ঘটেছে—তাদের সভ্যতা অহঙ্কারী মানুষদের সভ্যতার চাইতে অনেক...অনেক প্রাচীন!

তাই যদি হয়, তাহলে ডোগনদের ধর্মীয় গুপ্ত উপাখ্যান নিছক মনগড়া নয়। স্যাগান সাহেব অবশ্য এই উপাখ্যানের সত্যতা মানছেন অন্যদিক থেকে। তাঁর মতে, দূরবীক্ষণ ছাড়া এত জ্ঞান ডোগনদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। নিশ্চয় প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রণী কোনো সভ্যতার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ ছিল। প্রশ্নটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে একটাই: সে সভ্যতা কী? পৃথিবীর বাইরের না ইউরোপীয়?"

যেহেতু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা Sirius সম্পর্কে জ্ঞানী হয়েছেন এই সেদিন, অতএব, স্যাগান সাহেবের মতে, ইউরোপীয়রা ধুনি জ্বালিয়ে বসে মৌজ করে সেই গল্প শুনিয়েছে ডোগনদের এবং শুনেছে তাদের গল্পগাথা।

এই অনুমিতির বিরুদ্ধ মতগুলো তাহলে শোনা যাক।

এক॥ ধর্মের গুপ্ত অঙ্ক খুব উচ্চস্থানীয় ছাড়া কাউকে শেখানো হয় না ডোগনদের মধ্যে। যে ফরাসী নৃতত্ত্ববিদ এত তথ্য জেনেছিলেন, তাঁকে এক যুগ থাকতে হয়েছে ডোগনদের সঙ্গে এবং বিভিন্ন জনের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয় জেনে তবে জোড়াতালা দিয়ে পুরো ব্যাপারটা জেনেছেন। এত গুপ্ত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বিক্ষিপ্ত জ্ঞানের লেনদেন ধুনি জ্বালিয়ে মৌজ করে কি সম্ভব?

দুই॥ অসাধারণ আঙ্কিক এবং বৈজ্ঞানিক ত্রুটিহীনতা ডোগনদের উপাখ্যানে সম্ভবপর হয় কি করে? Siriusকে চোখে না দেখেই বলে কি করে তৃতীয় নক্ষত্র আছে সেখানে? অর্ধেক উপাখ্যান মিলে গেল আজকের বিজ্ঞানের আলোয়—বাকি অর্ধেক কি অলীক কল্পনা?

তিন॥ কি ভাষায় কথা হয়েছে জ্ঞান বিনিময়ের সময়ে? ফরাসী অথবা আরব ভাষায় নয়—সাঙ্গা আর ওয়াজোবা ভাষায়, এত উন্নত বিজ্ঞানের বিষয় অনুন্নত এই দুটি ভাষায় বিধৃত থাকে কি করে?

চার॥ এক ইউরোপীয় বিজ্ঞানীর মতে বছরে একবার মরুভূমিতে Sirius A-র লাল মরীচিকা থেকে Sirius B-র অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়েছে। ডোগনরা কখনো বলেনি Sirius B লাল—বলেছে সাদা, বছরে একবার দেখা যায়, একথাও বলে নি। দেখাই যায় না এই কথাই তো বলছে বারবার। মরীচিকা ব্যাখ্যা বলতে পারছে না, ডোগনরা কিভাবে বলে, ডিম্বাকৃতি (উপবৃত্ত) কক্ষপথে ছুটছে Sirius B 50 বছরে একবার—এ তথ্যেরও ব্যাখ্যা নেই মরীচিকা ব্যাখ্যায়।

সবই কি তাহলে মরীচিকা?

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে ধারাবাহিক রচনাটি এখানেই শেষ হল।

আগামী সংখ্যা থেকে

ধারাবাহিক উপন্যাস

সঙ্কর্ষণ রায়

এবং

নির্মলেন্দুবিকাশ পাত্র ও রাজেশ গিরির

দুটি আকর্ষণীয় ধারাবাহিক

মডেল বানাতে গিয়ে

মডেল-এর রকমফের

বিজ্ঞান সংবাদ

বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক লিটল ম্যাগাজিন নতুন দিগন্ত

মেদিনীপুর নিমপুরা থেকে বিজ্ঞান বিষয়ক একটি নতুন ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে। পত্রিকাটির নাম নতুন দিগন্ত। পত্রিকাটির সম্পাদক করুণাময় দাস। সম্পাদক বিজ্ঞানুরাগীদের কাছে সবরকম সহযোগিতার প্রার্থনা করেছেন।

বিজ্ঞান কর্মশালা ও প্রদর্শনী

মেদিনীপুর, সাওতিয়া মিলনী সঙ্ঘের উদ্যোগে গত 17 থেকে 21 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এক বিজ্ঞান কর্মশালা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। আলোচনা চক্র ও প্রদর্শনীতে গ্রামীন পরিবেশে বিজ্ঞান ও উচ্চতর প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যবহারের বিভিন্ন দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সি. ভি রমন জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিজ্ঞান উৎসব

কাঁচড়াপাড়া ইলেকট্রনিক কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে গত 10—12 ফেব্রুয়ারি কাঁচড়াপাড়া মীনা সুপার মার্কেটে বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল কমপিউটার ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিকস্ মডেল প্রতিযোগিতা।

সুস্বাস্থ্য চক্রের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন

গত 26 ফেব্রুয়ারি কাথি সুস্বাস্থ্য চক্রের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বীরেন্দ্র স্মৃতি সৌধের সভাগৃহে। শাখাসমূহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মেলা 1989

বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার উদ্যোগে গত 9—12 ফেব্রুয়ারি বালীগঞ্জ গভঃ হাইস্কুলে এক মনোজ্ঞ বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে প্রায় 150 জন সফল প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রদর্শনীতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি নৈপুণ্যের বিভিন্ন মডেল প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কলিকাতা কর্পোরেশন-এর মেয়র শ্রীকমল কুমার বসু।

মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত জনবিজ্ঞান অনুষ্ঠান

গত 12 জানুয়ারি হতে 19শে জানুয়ারি পর্যন্ত জাতীয় যুব সপ্তাহ সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনে অনুষ্ঠিত হয়। এর যৌথ উদ্যোগে ছিলেন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন এবং নেহেরু যুব কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ শাখা।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রদর্শনীর মধ্যে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ভার দেওয়া হয়েছিল মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ ওপর। উক্ত বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ সভ্য ও সভ্যারা এবং ঐ মিশনের ছাত্রদের সহযোগিতায় বিজ্ঞান ভিত্তিক মডেল এবং কুসংস্কার সংক্রান্ত খেলা গত সাত দিন ধরে সাফল্যের মধ্য দিয়ে প্রদর্শন করেন। সারগাছির স্হানীয় জনসাধারণ এই প্রদর্শনী উপভোগ করেন।

গত 5—8ই ফেব্রুয়ারী, 1989 স্থানীয় শহীদ সূর্য সেন পার্কে এক অভিনব শিশুমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় শিশুদের উপযোগি বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের সাথে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা ছিল। মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদের সভ্য/সভ্যারা এই বিজ্ঞান প্রদর্শনীটিকে শিশুদের মনের উপযোগি করে উপস্থাপন করে সকলের ধন্যবাদার্হ হয়। বিশেষ করে কুসংস্কার বিরোধী খেলাগুলি শিশুদের মনে বিশেষ ভাবে রেখাপাত করে।

গত 1লা হতে 3রা ফেব্রুয়ারী ঔরঙ্গবাদে, জেলা-বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন স্কুল এবং ক্লাব এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ-এর দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন

গত 28 ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান-দিবসে জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতির সভাগৃহে। বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার অর্পন করা হয়। সভায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কার্টুন / রেবতীভূষণ

মশা তাড়ানোর যন্ত্র

শুভাশিস বিশ্বাস

বাজারে আমরা দেখে থাকি নানা ধরনের মশা তাড়াবার যন্ত্র। একটার নাম যেমন GOOD NIGHT। অবশ্যই সেগুলির দাম একটু বেশি হবার দরুন, আমরা জন-সাধারণ ও Electronics বন্ধুরা তার সদ্ ব্যবহার করতে পারিনি। যার জন্য তোমাদের দিকে নজর রেখে, তোমাদেরকে আজ এমন একটা মডেল উপহার দেব যা তোমরা নিজেরাই তৈরি করতে পারবে। তৈরী করাটাও কিন্তু ভীষণ মজার তাই না! আর নির্মাণব্যয় বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক কম।

Component List

T_1 2N2646 (PNP)
T_2 BC 148B (NPN)
C-IN4148
Resistance 10 K
680 Ω
100 Ω
18 Ω
10k V/C without Swich

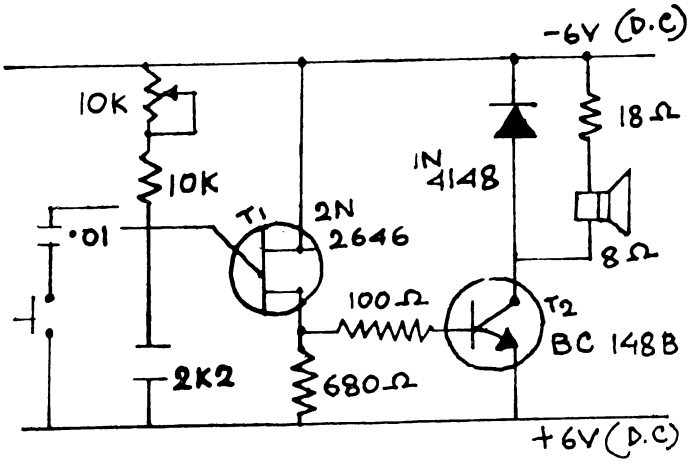

CIRCUIT DIAGRAM

গরম, শীত সবসময়ই মশার উপদ্রব ভীষণ পরিমাণে থাকে এবং মশাগুলি ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু বহন করে মানুষকে আক্রান্ত করে। এর থেকে রেহাই পাবার জন্য এসো আমরা সবাই কাজে লেগে পড়ি।

আমি আশা রাখতে পারি আমার সব Electronics বন্ধু-গণ একসঙ্গে মডেল তৈরীর কাজে তৈরী বা প্রস্তুত হয়ে নেবে/নেবেন।

এসো তাহলে সবাই লেগে পড়ি। নির্মাণ কার্যে।

উপরে CIRCUIT DIAGRAM দেওয়া হয়েছে।

Condenser—
·01 mf
2 k 2
Speaker 8 Ω—1 pec 4"

Vero Bord—1 pce, Switch 1 pee on/off Wire, Solder, Squre, Battery Cabinet for Circuit Bordes speaker, E.T.C

তোমরা সব পার্টস্ গুলি পরীক্ষা করে লাগাবে নয়তো

মডেল কার্য নাও করতে পারে Parts খারাপ এর জন্য আর পার্টস্ গাথ্‌বে Vero Bord-এ সুন্দর ভাবে।

কার্য-কৌশল সম্পর্কে একটু আবার জানা দরকার তাই না! এসো কিছুটা অন্তত জানি। পরিবেশের জীবাণু বহন কারী (ম্যালেরিয়া) স্ত্রী মশাগুলি এই রিপালারের তৈরী Frequencyতে বিশেষ বিকর্ষন অনুভব করে। এর এক বিশেষ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ প্রায় 22KH_2 এই মালটিভাইব্রেটর এ হয় এবং মশাকে তাড়াতে সাহায্য করে Ultra Sonic এই শব্দের ক্ষমতা সহ্যের জন্য ভাল 8E/Ω Speaker প্রয়োজন। আবার বলছি parts পরীক্ষা করে তার পর লাগাবে নইলে Circuit কাজ না করলে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

প্লাস্টিক্ ক্যাবিনেটে সেট কোরো। তাহলে সুবিধা হবে তোমাদেরই। আর 10K Preset টি—কম্পনাঙ্ককে Adjust বা সমন্বয় করবার জন্য এটারও কিন্তু কাজ অনেক। যদি কেউ Eleminator না করতে পার তাদের জন্য আর 1টি সার্কিট দেওয়া হোল—

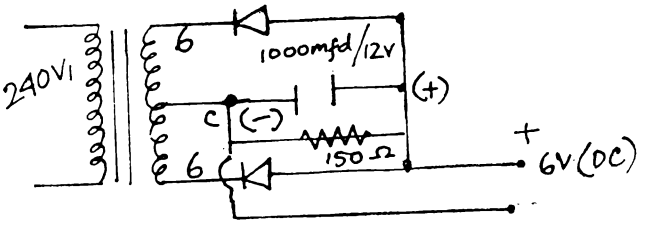

এবারে সব সঠিক যায়গায় বসিয়ে রাত্রে ঘুমাবার আগে এটাকে ব্যবহার করবে, কোন চেয়ার অথবা টেবিলে রেখে প্লাগে Main Cord ঢুকিয়ে সুইচ অন্ করলে তোমার নিজের তৈরী জিনিসের আনন্দের ফুলঝুরি বইবে।

যদি কোন অসুবিধা হয় আমাকে জানাবে কিন্তু।

সব উপকরণগুলি বড় ইলেকট্রনিক্সের দোকানে বা কলকাতার ম্যাডানস্ট্রীট ও চাঁদনীচকের দোকান গুলিতে

যাদের বাড়ীতে বিদ্যুৎ লাইন আছে তারা Battery Eleminator দিয়ে চালিয়ে রাখলে Battery খরচ কম হবে অবশ্য যাদের নেই তারা 6v. DC ব্যাটারী দিয়ে চালিও কেমন!

তোমরা সমস্ত ব্যবস্থাটাই Setting একটু বড় মাপের পাবে। বসে থেকোনা। চট্‌পট্ লেগে পড়ো, আরো মজার মডেলের জন্য তো আমি আছি। আরো পাবে।

আজ আসি তাহলে! আমার ইলেকট্রনিক্সের পাঠক/পাঠিকা বন্ধুগন।

বগুলা কলেজ পাড়া, নদীয়া।

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর

প্রথম খণ্ড ॥ তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম দশ টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম দশ টাকা

প্রতিখণ্ডে প্রায় অর্ধশত মডেলের সার্কিট ডায়াগ্রামসহ নির্মাণ প্রণালীর ব্যাখ্যা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ॥ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

[61 পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ ঝিঁ ঝিঁ পোকারা কেমন করে শব্দ উৎপন্ন করে ? কানাইলাল সাহা, কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

উঃ ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের দ্বারা উৎপন্ন শব্দ জীব-বিজ্ঞানীদের মতে একটা বড় বিস্ময়। ওরা মুখ দিয়ে শব্দ করে না এবং কানের সাহায্যে কোন কিছু শোনেও না। টিপ্পানক মেমব্রেন নামে একটি বিকল্প কানের মাধ্যমে ওরা সবকিছু শোনে।

ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের শব্দকে নিয়ে বহুজনে বহু গবেষণা করেছেন। বিশেষ করে বাংলার গোপাল ভট্টাচার্য এবং আমেরিকার আব্রাহাম মোল এদের সম্বন্ধে বহু তথ্য উদ্ঘাটন করে গেছেন। নিজের উদরদেশের সঙ্গে পেছনের পা দুটোকে অতি দ্রুত (সেকেণ্ডে 25 থেকে 40 বার) ঘর্ষণ করে এবং তাতেই উৎপন্ন হয় জোরালো শব্দ। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, উক্ত শব্দের মাধ্যমে ঝিঁঝিঁরা নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে। তাই তাদের স্বজাতীয়দের কাছে শব্দটা বিশেষ অর্থবহ। সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপারটা হচ্ছে, ঝিঁঝিঁ পোকাদের একটানা কর্কশ শব্দের বৈশিষ্ট্য আমাদের কাণে ধরা পড়ে না। অথচ ঐ শব্দের ভেতর দিয়ে তারা নানা ধরনের মনোভাব প্রকাশ করে—যা ওরাই কেবলমাত্র বুঝতে পারে এবং বুঝে সাড়াও দেয়।

প্রঃ মৌমাছিরা কিভাবে বাসা ও গন্তব্যস্থল নির্ণয় করে ? প্রণব ঘোষ, কুরুমাহারা, বীরভূম।

উঃ বিজ্ঞানীদের মতে মৌমাছিদের মধু সংগ্রহ অভিযান এবং মধু সন্ধান দস্তুরমত একটি চমকপ্রদ ব্যাপার। অধ্যাপক কার্ল ফ্রিসচ্, আদ্রিয়ার ওয়েনার প্রভৃতি জীববিজ্ঞানীর মতে বাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে কর্মী মৌমাছিরা যে নৃত্য শুরু করে এবং গুণ গুণ করে গান ধরে তা তাদের নিছক আনন্দের অভিব্যক্তি নয়। ওরা ভয়ানক কাজের লোক। বসে থেকে নাচা, গান গাওয়া বা আরাম করা তাদের কাছে 'হারাম'। নাচগানের মাধ্যমে তারা জেনে নেয় বাসা থেকে কতদূর মধুর উৎস এবং কোন দিকে, মধুর ঘনত্ব ইত্যাদি। কেউ মধুর উৎসের সন্ধান লাভ করলেও নৃত্যের ভঙ্গিমায় প্রকাশ করে এবং দলের অন্যান্যদের জানিয়ে দেয়।

সবচেয়ে আশ্চর্য, ওদের বাসা ছেড়ে মধুর উৎসের কাছে ছুটে যাওয়া ও নির্ভুল পথে ফিরে আসা। বাসা থেকে প্রায় 5 কিলোমিটার দূর পর্যন্তও তারা মধু সংগ্রহের জন্য ছুটে যায়। তবে তারা ঐ কাজটি দিনের বেলায় আকাশে সূর্য যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই করে থাকে। এমন কি মেঘলা দিনেও। কিন্তু রাতে পারে না।

অধ্যাপক ফ্রিসচ্ এর গবেষণা থেকে জানা গেছে, মৌমাছিদের যৌগিক চোখ সূর্য রশ্মিকে পোলারাইজ করে দেখতে পায় বলে মেঘলা দিনেও কোন অসুবিধা হয় না। আরও জানা গেছে, সূর্যই ওদের পথ নির্দেশ করে থাকে। আকাশে সূর্যের অবস্থান এবং তাদের বাসা দুটিকে সংযোগ করলে যে রেখাটি উৎপন্ন হয় তার সঙ্গে মধুর উৎস পর্যন্ত একটা কোণ তারা দিব্যি নির্ণয় করে নেয়। সূর্যের দিকে অথবা সূর্যের বিপরীতে কোন্ দিকে তথা বামাবর্তে কিংবা দক্ষিণাবর্তে যেতে হবে তাও নির্ণয় করে নেয় বাসায় নৃত্য করতে করতে।

মধু সংগ্রহ করে ফিরে আসার সময় সূর্যের আকাশে স্থান পরিবর্তন ঘটে। তাতেও তাদের অসুবিধা ঘটে না। ফুলের উপর নৃত্য করতে করতে বাসার অবস্থিতি সূর্যের দ্বারাই ঠিক করে নেয়। অন্ধ তারা জানে না, দিক নির্ণয় যন্ত্রও আমাদের মত নেই, তবু এই জটিল আঙ্কিক পদ্ধতিটি তাদের একেবারে সহজাত। তোমরা বড় হলে এ বিষয়ে গবেষণা করতে পারো। বেশি জানতে চাইলে গোপাল ভট্টাচার্যের বাংলা বই এবং K. von. Frisch ও M. hindauer এর ইংরেজী বই পড়। বিরাট ও জটিল জিনিস প্রশ্নোত্তরের পৃষ্ঠায় আলোচনা করা সম্ভব নয়।

প্রঃ সব মানুষের একই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তবু মেধার তফাৎ কেন ? ওষুধ খেলে কী মেধাবৃদ্ধি হয় ? মনের উপর চাপ পড়লে মানুষ কেন পাগল হয়ে যায় এবং আত্মহত্যা করে ? ভালভাবে মনে রাখার উপায় কী ? আত্মহত্যার পেছনে কী কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে ? ইত্যাদি প্রশ্ন করেছে : (1) পার্থসারথী রেজ, তারকেশ্বর, হুগলী। (2) বিমল, শ্রীগৌরাঙ্গ ছাত্রাবাস, দক্ষিণ রাধানগর, 24 পরগনা। (3) বাবলু বিশ্বাস, অশোক নগর, কল্যাণগড়, বিদ্যামন্দির, 24 পরগনা।

উঃ শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেমন পুষ্টি দরকার তেমনই দরকার মস্তিষ্কের পুষ্টি। মস্তিষ্ক পুষ্ট হলেই মানুষ মেধাবী হয়। পুষ্টিটা আবার শুরু হয় মাতৃগর্ভে অবস্থান কাল থেকে। মায়ের অপুষ্টি, অসুখ-বিসুখ, পিতা-মাতার বংশগত কোন রোগ, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল পরিবেশ ইত্যাদির ফলে শিশুর সর্বাঙ্গীন পুষ্টির ব্যাহত হয়। অপর দিকে জন্মাবার পরও খাদ্য ও পরিবেশ যথোপযুক্ত না হলে মস্তিষ্কসহ শরীরের সমূহ অঙ্গ সুগঠিত হতে পারে না। তাই মেধার মূলে আছে মাতৃগর্ভ থেকে প্রায় 16 বছর বয়স পর্যন্ত প্রকৃত পুষ্টি এবং উন্নত পরিবেশ।

মেধা বৃদ্ধির জন্য বাজারের প্রচলিত ওষুধসমূহের কোন ভূমিকা বিশেষ নেই। সুষম খাদ্য গ্রহণ করলে, উপযুক্ত রোগ প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করলে, পরিবেশের উন্নতি হলে

এবং সৎচিন্তার মাধ্যমে মনকে একাগ্র করতে পারলে মেধার বিকাশ ঘটবে। যে কোন প্রকারের গোঁড়ামি, কোন কিছুর প্রতি ভয় বা আসক্তি, ক্রোধ, আক্রোশ ইত্যাদির বশীভূত হলে মেধার অবনতি ঘটে।

আজকের উন্নত বিজ্ঞান শিশুকে মেধাবী করে গড়ে তোলার নানা ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এবং এবিষয়ে গবেষণাও হচ্ছে প্রচুর। তবে সে তো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। তোমরা যারা মেধাবী নও বলে মনে করো, তারা মনকে সংযত ও দৃঢ় করবে। মনে রাখবে, কোন না কোন বিষয়ে প্রতিভা তোমাদের আছেই এবং পরীক্ষাতে ভাল ফল দেখাতে পার না বলে হীনমন্যতায় ভুগছো। এটি অত্যন্ত খারাপ। মেধাহীন বলতে একমাত্র জড়রা—প্রতি দশহাজারেও একটা পড়ে না। তাহলে কী করবে? (১) সুষম খাদ্য গ্রহণ করবে, (২) পরিবেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবে, (3) সুস্থ চিন্তা ও মনঃসংযোগের মাধ্যমে মনকে উন্নত করবে, (4) বাজে চিন্তার মাধ্যমে মস্তিষ্ককে অসংযত করবে না, (5) সংস্কার ও ভয় থেকে বিরত থাকবে এবং (6) মানসিক আবেগের বশীভূত হবে না।

মানসিক আবেগ অসংযত মনের ফসল। পারিপার্শ্বিক কোন ঘটনাকে অবলম্বন করে অনেক সময় মন উত্তেজিত হয়। ঐ উত্তেজনাকে যদি বেশি সময় ধরে রাখা যায় তাহলে মনের উপর ভয়ানক চাপ পড়ে। এর প্রভাবে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস গ্রন্থিতে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ফলে রাগ, ভয়, হিংসা, ক্ষোভ, লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃতির অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। অভিব্যক্তিগুলি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকলে এক সময় হাইপোথ্যালামাসগ্রন্থি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে আর নানারকমের শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তখন বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নির্গত হয় নানা ধরণের হরমোন এবং এরা শরীরের জৈব রাসায়নিক ক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত করে, আলো তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠে এবং মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলে মানুষ আত্মহত্যার মত হীন কাজেও প্রবৃত্ত হয়। কখনও বা পাগল হয়ে যায়।

অতএব কোন সময় আবেগের বশীভূত হতে নেই। যখনই কারও মধ্যে কোন আবেগ আসবে তখনই যদি সে মনে করে—এটি হরমোনের ক্রিয়া তাহলে আবেগ অনেকখানি প্রশমিত হয়ে পড়বে।

আবেগকে গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করতে পারলে কিংবা রূপান্তরিত করতে পারলে মানুষ জগৎ পূজ্য হয়। আবেগ চণ্ডাশোককে রূপান্তরিত করেছে রাজর্ষি অশোকে, রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে করেছে গৌতম বুদ্ধ, কন্যাস্নেহ ভাস্করাচার্যকে করেছেন মহাবিজ্ঞানী। ওয়াক্সম্যানের যক্ষার প্রতিষেধক আবিষ্কারের পেছনে আছে তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনীর অকালমৃত্যু। এমনই কত অজস্র কাহিনী!

জীবনে চলার পথে যদি কখনও কারও কোন আবেগ আসে তাহলে শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া ভেবে একটু হাসতে চেষ্টা করবে। অবশ্যই মনে রাখবে, মন এমন একটি জিনিস—সে দীর্ঘকাল কোন কিছুকে ধরে রাখতে পারে না। সময় সব কিছুকে ভুলিয়ে দেয়। আবেগ তাই সাময়িক।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

যাবতীয় কিশোর রচনার সচিত্র সংস্করণ

কিশোর রচনা সমগ্র

একখণ্ডে সম্পূর্ণ ॥ দাম ৪০·০০

সম্পাদনা ঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ॥ মায়া মজুমদার

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

কুকুবোরা এক অদ্ভুতদর্শন পাখি

এদের বাস অস্ট্রেলিয়ায়। ওদের দেখতে যেমন হাস্যকর তেমনি ওদের বিদ্‌ঘুটে ডাক শুনলে মনে হবে ওরা হাস্যধ্বনি করছে।

সন্ধ্যা হলে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লে আকাশ লাল কমলা হয়ে উঠল, আর সেই সময় কুকুবোর. ডেকে উঠল। এক জনের ডাক শুনে কয়েক শ' ডেকে উঠবে। ওদের ডাক মানেই হো-হো করে হাস্যরব। কেন যে ওরা হাসে তা শুধু ওরাই জানে। লোকে তাই ওকে গাধা পাখি বলে।

ক্যুইজ কনটেস্ট

গ্রেড I

মার্চ '89 VII—VIII

1. $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$ এবং $\frac{4}{5}$ এর মধ্যে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যাদ্বয় নির্ণয় কর।

2. এক ব্যক্তি একই তারিখে 5% হারে 500 টাকা এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে রাখলেন এবং 6% হারে 450 টাকা পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে রাখলেন। ঐ ব্যক্তি তিন বছর পর কোন্ ব্যাঙ্ক থেকে বেশি সুদ পাবেন?

3 নিচের কোন্‌টি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া নয়?

(ক) ব্যাপন (খ) দহন

(গ) বাষ্পমোচন।

4. কোন্ জীবাণুর সাহায্যে দুধ থেকে দই হয়?

5. মানুষের চোখ পুঞ্জাক্ষি না সরলাক্ষি?

6. 10 ঘন সে. মি. একটি বস্তুর ভর 74 গ্রাম এবং ঘনত্ব x হ'লে x এর মান gm cc. তে কতো হবে?

7. এঁকে "The father of the automobile" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইনি কে?

8. একটি লরী ও একটি মালগাড়ি সমবেগে চলছে বলে ধরে নাও। কোন্ গাড়িটিকে সহজে থামানো যাবে?

9. কোন্ বিজ্ঞানী গ্যাসের ধর্ম নিয়ে গবেষণা ক'রে বিখ্যাত হন্?

10. ক্লোরিন গ্যাসের রং কেমন?

গ্রেড II

মার্চ '৪9 IX—X

1. EPSOM কথাটি কোন্ খেলার সঙ্গে যুক্ত?

2. গ্যাস ইঞ্জিনের আবিষ্কর্তার নাম কি?

3. সোল অলিম্পিকে (1988) সর্বাধিক স্বর্ণপদক লাভ করে ছিল কোন্ দেশ?

4. সেক্সপীয়রের কোন্ নাটকের একটি চরিত্রের নাম 'ডেসডিমোনা'?

5. হিজরী সন কবে থেকে শুরু হয়?

6. জেমস্ বন্ড চরিত্রটির স্রষ্টা কে?

7. পর্তুগীজদের হাত থেকে গোয়া ভারতের অধীনস্থ হয় কবে?

8. ইনি একজন বিখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়। এঁর নাম কি?

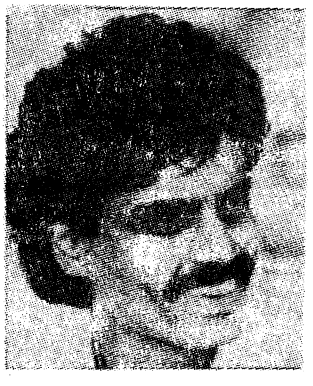

9. কাঁর রাজত্বকালে ইবনবতুতা ভারত ভ্রমণ করেছিলেন?

10. TEXACO CUP এর সঙ্গে কোন খেলার নাম জড়িত?

গ্রেড III

মার্চ '89 XI—XII

1. বিশ্বের কোন শহরে জনসংখ্যা সর্বাধিক?

2. MAPUTO-র রাজধানীর নাম কি?

3. "The Heavy Engineer" ing Corporation" ভারতের কোথায় অবস্থিত?

4. 24. 10. 1945 তারিখটি বিশ্বের ইতিহাসে কি জন্য বিখ্যাত?

5. 'জিন্ পল সার্ত্রে' কোন্ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করতেন?

6. "The Hall of Nations" ভারতের কোথায় অবস্থিত?

7. SHAR ভারতের কোথায় অবস্থিত?

8. ক্রিকেট খেলার সঙ্গে যুক্ত এই কাপটির নাম কি?

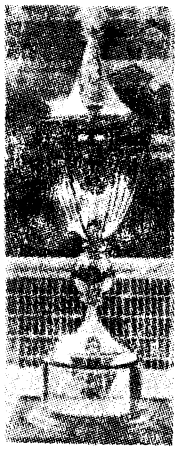

9. CETAKA কোন দেশের সংবাদ সংস্থা?

10. 'দিলওয়ারা' মন্দির' কোন ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?

শ্রীদাম সরকার

পাশাপাশি ঃ

1. বস্তুর স্থির বা গতিশীল অবস্থা যার দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। 3. টিন ও তামার তৈরি সংকর ধাতু। 4. রক্ত অ্যান্টিবডি গঠন করে যে পদার্থ ধ্বংস করে। 5. প্রাণীদেহে অ্যান্টিবডি উৎপন্নের জন্য দেওয়া হয় যা। 6. গ্যাস্ট্রিক জুসের জৈব উপাদান, যা দুগ্ধ প্রোটিনকে কেসিনে পরিণত করে। 8. আপেলে উপস্থিত অ্যাসিড। 9. মানুষের প্রধান রেচনযন্ত্র। 10. 'ক্যালোরি' একক দ্বারা মাপযোগ্য শক্তি। 11. H_2O.

উপর-নিচ ঃ

2. 'রিক্সা ওলেরেনা' যার বৈজ্ঞানিক নাম। 3. মানুষের শব্দগ্রাহক অঙ্গ। 5. লোহার জিনিসকে টিনের প্রলেপ দেওয়া। 7. একটি জৈব এসিড। 8. মাইক্রো বা মাইনর এলিমেন্টের একটি। 9 সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন প্রস্তুত করা হয় '—' যন্ত্রে।

শ্রীদাম সরকার, মিলন নগর, বগুলা, নদীয়া।

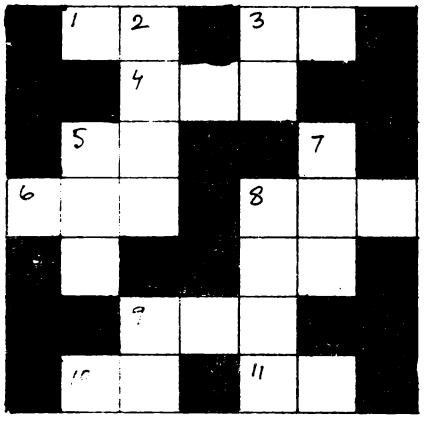

চক—৭

আই কিউ টেস্ট মার্চ '89

1. যদি 194 সংখ্যাটির দ্বারা AID শব্দটি বোঝায়, তাহলে BEEF শব্দটি দ্বারা কোন সংখ্যাটি বোঝাবে?

2. হাইড্রোকার্বনের অ্যালকক্সি যৌগ বলা হয় কাকে?
(a) ইথার, (b) এস্টার, (c) অ্যালডিহাইড।

3. অর্ধবৃত্ত অপেক্ষা সূক্ষ্মতর বৃত্তাংশস্থিত কোণ
(a) সমকোণ, (b) সূক্ষ্মকোণ (c) স্থূলকোণ।

4. 'ফোয়ারা পরীক্ষা' করা হয় যে গ্যাসটির সাহায্যে সেটি হলো—
(a) অ্যামোনিয়া, (b) কার্বন-ডাই-অক্সাইড, (c) নাইট্রোজেন।

5. CEFTRI বলতে কী বোঝায়?

জানুয়ারি '89 গ্রেড-I এর সমাধান

1. কুষাণ। 2. তাপ বিকিরণ মাপবার এক অতি সুবেদী যন্ত্র। 3. (c) পিতল। 4 পুঞ্জাক্ষিতে একটি বস্তুর একাধিক প্রতিবিম্ব পড়ার ফলে বস্তুটিকে অস্পষ্ট দেখা যায়। 5. স্পোর অযৌন জননের একক শেওলা, ছত্রাক, মস, ফার্ণ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে দেখা যায়। 6. বুনো গাধা। 7. কোন গতিশীল বস্তু তার গতীর অবস্থার জন্য যে শক্তি ধারণ করে তাকে গতীয় শক্তি বলে। 8. দ্বিতীয় ও তৃতীয় হ্রস্ব পর্যায়ের মৌল গুলিকে আদর্শ মৌল বলে। 9. লাউডস্পিকার, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিফোন যন্ত্র। 10. আর্মেন্দিও অ্যাভোগাড্রো।

জানুয়ারি '89 গ্রেড-II এর সমাধান

1. 1891 খ্রীঃ শ্রীঅরবিন্দ লণ্ডনে Lotus and Dagger নামে এক গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। 2. এক ফার্মি 3. (b) $FeCl_3$ 4 e) রুশো 5. জ্যাকেমোঁ 6. পঞ্চায়েত 7. (b) RNA থাকে 8. রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ ইনসুলিনের কাজ। 9. অবতল লেন্স। 10. রবার্ট হুক আবিষ্কৃত মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র।

জানুয়ারি '89 গ্রেড-III এর সমাধান

1. (b) মৌমাছি 2. ATS-6 নামক ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহকে। 3. The Black Mamba 4. প্রোটন ও নিউট্রনকে সম্মিলিত ভাবে। 5. 8 গুণ। কারণ $E = \frac{1}{2} mv^2$। 6. (c) 45°। 7. নীরস বিদারী ফল। 8. A_2 অণু বহন করা। 9. ডেভিড হেয়ার। 10. মেঠো ঝিঁঝিঁ পোকা

আই কিউ টেস্ট সমাধান

জানুয়ারি '89 এর সমাধান

1. 15। 2. (ii) ac/6. 3. (b) কারণ, আবিষ্ট তড়িৎচালক বলের মান চৌম্বক বল রেখার পরিবর্তনের হারের সঙ্গে সমানুপাতী। 4. (b) রাজকুমারী অমৃতা কাউর। 5. (a) হায়দ্রাবাদ

শব্দকূট সমাধান

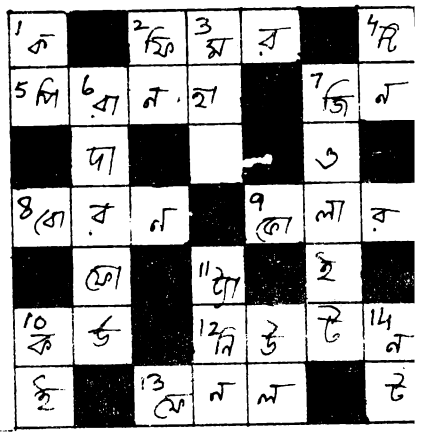

আকন্দ

এণাক্ষী বিশ্বাস

ত্রিকালদর্শী শিব ঠাকুরের প্রিয় ফুল আকন্দ তা সকলেরই জানা। শিব ঠাকুর যেমন আপন ভোলা যত্রযত্র নেশা ভাঙ খেয়ে নেশায় বুদ হয়ে থাকেন তেমনিই আকন্দ ফুল গাছটি ভারতে যত্রযত্র পরিত্যক্ত জমিতে দেখতে পাওয়া যায়। এর কোন আভিজাত্য নেই। আপনা হতেই ঝাড় হয়।

আকন্দ 8-10 ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট বহু বর্ষ জীবি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা সরল, উপবৃত্তাকার, বিন্যাস অভিমুখ-তির্যকপন্ন হয়। ফুল বুনোগন্ধযুক্ত হাল্কা বেগুনী বা সাদা রঙের হয়। উদ্ভিদের যে কোন অংশ ভাঙ্গলেই সাদা দুধের মত পদার্থ বার হয়। আকন্দ উদ্ভিদের দেহে এক বিশেষ রকমের কলা আছে। যে কোষগুলি হইতে নানারকম পদার্থ নিঃসারিত হয়। এই কোষগুলিকে ক্ষীর-কোষ বলে এবং বহিঃক্ষরিত গাঢ়, ঘন দুধের মত পদার্থকে তরুক্ষীর বলে। বিশেষতঃ আকন্দ উদ্ভিদে এই কোষ এককোষী সজীব, নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং উদ্ভিদের মত শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন করে ও কখনও পরস্পর যুক্ত হয় না। এই তরুক্ষীর বিষাক্ত। অসাবধনতাবশতঃ চোখে লাগলে চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ফুলের আকৃতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ফুলের পাঁচটি পাঁপড়ির মাঝখানে পাঁচটি পরাগকেশরযুক্ত হয়ে গর্ভদণ্ডটি ঘিরে একটি নালী তৈরি করে। পুংদণ্ডটির গায়ে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ অংশ বহন করে। ইহা Staminal coaona নামে পরিচিত। ইহা ফুলটিকে এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্য প্রদান করে যাহা ফুলটিকে সহজেই নিহিত করতে সাহায্য করে। আবার গর্ভমুণ্ড ও পরাগকেশর যুক্ত হয়ে একটি পাঁচকোনা ষ্টেজ তৈরি করে। এই ধরনের যুক্ত পরাগকেশর ও গর্ভ-কেশরকে গাইনোষ্টেজিয়াম বলে। ইহা এই উদ্ভিদটির গোত্রের পরিচয় বহন করে। পাঁচকোনা ষ্টেজের পাঁচ কোণে পরাগ থলি থাকে। ফুলের বুনো গন্ধে পতঙ্গ আকৃষ্ট হয়ে ফুলের পরাগ থলি পতঙ্গের পায়ে আটকে যায় এবং অন্য ফুলে মধু খেতে গিয়ে পরাগযোগ ঘটে। ফুল থেকে ফল হয়। ফলকে ফলিকল বলে। এই প্রকার ফল মুক্ত গর্ভ থেকে জন্মলাভ করে এবং উপরদিকে সামান্য যুক্ত থাকে। ফল পরিপক্ক হলে একটি প্রান্ত ফেটে বীজ ছড়িয়ে পড়ে। এইজন্য এই ফলকে বিদারী ফল বলা হয়।

এর বীজ থেকে রেশমের ফ্যাসা পাওয়া যায়। যেগুলি বালিশে রাখা যেতে পারে। তাছাড়া কম দৈর্ঘের সূতা কাটার পক্ষে অসুবিধা, কিন্তু তুলোর সূতোর সঙ্গে মিশিয়ে নিলে ভাল রেশমের মত সূতো পাওয়া যেতে পারে যেগুলি ধুতে অসুবিধা নেই এবং রঙ করাও যায়।

আবার এই আকন্দের কাণ্ডের ছাল থেকেও শক্ত মজবুত সূতা পাওয়া যায়—যেগুলি দিয়ে মাছের জাল বিশেষতঃ সমুদ্রের মাছ ধরা হয়। কারণ সমুদ্রের লোনা জলে এই সূতার ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশী।

তরুক্ষীর থেকে প্রস্তুত হয় gutta-percha এবং ট্যানিন শিল্পে এর ব্যবহার হয়। বিশেষতঃ চর্মশিল্পে হলুদ রঙের জন্য ইহার ব্যবহার করা যায়।

আকন্দের কাঠ থেকে পাওয়া যেতে পারে হাল্কা ধরনের কাঠকয়লা। এছাড়া এই গাছের ছাই থেকে পাওয়া যায় পটাশ।

আবার ইহা ওষধি গাছও। এর থেকে তৈরি হয় চর্মরোগের ঔষধ, টিউমার, যকৃত রোগ, হাঁপানি ইত্যাদির ঔষধ। কোঠকাঠিন্য দূর করার জন্য জোলাপ প্রস্তুত হয়।

ইহা ভারতীয় উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম ক্যালোট্রপিস জাইগেনশিয়া। গ্রীক শব্দ ক্যালোস কথার অর্থ সুন্দর, 'ট্রপিস' কথার অর্থ জাহাজের তলা অর্থাৎ আকন্দের ফলের আকৃতির সঙ্গে মিল। জাইগেনশিয়া কথার অর্থ বড়—উঁচু। ইহা অ্যাসক্লিপিয়াডেসি গোত্র ভুক্ত।

ইহার বীজ থেকে বংশবৃদ্ধি হয়।

ইহার অন্য প্রজাতিটি ক্যালোট্রপিস প্রসেরা।

ফটো : সুবল কৃষ্ণ দে

বলতে পারো কেন ?

সুধাংশু পাত্র

গত মাসের নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর

"গিরগিটিরা কেমন করে রঙ বদলায়"

উঃ। গিরগিটি জাতীয় এক শ্রেণীর প্রাণী তথা বহুরূপীরা নিজেদের ইচ্ছেমত গায়ের রং বদলাতে পারে। ওদের গায়ের চামড়ায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণুতে ভরা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ থাকে। ঐ রেণুর উপর সূর্যের আলো পড়লে প্রতিফলিত হয়।

ওদের কিছু কিছু কোষে বাদামী বা লালচে রঙের রঞ্জক পদার্থও থাকে। যখন বহুরূপীরা দেহের চামড়াকে সংকুচিত কিংবা প্রসারিত করে তখন তাদের কোষের রঞ্জক পদার্থ-গুলো ওঠানামা করে। এমনিতে তাদের কোষ মধ্যস্থ রেণুর উপর সূর্য রশ্মি পড়ে প্রতিফলিত হলে সাদা আলো সৃষ্টি করে। কিন্তু চামড়া সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে রঞ্জক পদার্থগুলো উপরে উঠে আসে এবং তখন বহুরূপীকে কালো দেখায়। রঞ্জক পদার্থগুলো চামড়ার একটু নিচে থেকে গেলে চামড়ার রঙ সবুজ দেখায়। আর চামড়ার যেসব জায়গায় রঞ্জক পদার্থ নেই, সে সব জায়গাকে হলদে দেখায়। পারি-পার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কিংবা শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ইচ্ছে করে গায়ের চামড়া সংকুচিত ও প্রসারিত করে। আবার শীত, গ্রীষ্ম, তাপ, উত্তেজনা ইত্যাদির প্রভাবেও তাদের গায়ের রঙ আপনা হতে কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়।

এ মাসের নির্বাচিত প্রশ্ন ঃ

"ফোটন কণা কী ?"

জানতে চেয়েছে রূপকুমার মুখার্জি, 221 ক্ষেত্র ব্যানার্জী লেন —শিবপুর—হাওড়া-2।

সমুদ্রের জল নীল দেখায় কেন ? সমুদ্রের জল লোনা কেন ? অস্তমিত সূর্যকে লাল দেখায় কেন ? ভূমিকম্পের কারণ কী ? নক্ষত্রের আলো মিটমিট করে কেন ? সাইক্লোট্রন যন্ত্রটি কী ? ওল খেলে গলা কুটকুট করে কেন ?

প্রশ্নগুলি পাঠিয়েছো (১) নীতিশ কুমার পাল, আটি-পুই নাম-হুগলী ; ২) রথীন ব্যানার্জী, বরুই বর্ধমান ; (৩) স্বপন কুমার গায়েন, হরিশপুর—গোসাবা-24 পরগণা ; (৪) সন্দীপ মাহাতো, ঘোড়াধরা হিন্দিস্কুল—ঝাড়গ্রাম-মেদিনীপুর : (৫) তাপস পাত্র, চণ্ডীদাস প্রামাণিক, শৈলেন শিকারী, সুবীর মণ্ডল, কালিদাস নসূর, নিমপীঠ আশ্রম রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন—জয়নগর দঃ চব্বিশ পরগণা ; (৬) মনীন্দ্রকুমার জানা ও সুতপা ঘোষ, খালোড়—বাগনান-হাওড়া ; (৭) ইতিকণা সামন্ত—রায়না বর্ধমান, (৮) কৃষ্ণা মল্লিক, বোড়া-বুজরুকদীঘি-বর্ধমান ; (৯) কার্তিক, বুবু, রিঙ্কু, ছটু, রাখী ও পাখী মানুষ মুড়িয়া—সিংভূম ; (১০) শ্রীকান্ত প্রধান, দঃ কাশীনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাথর প্রতিমা-24 পরগণা।

উঃ—মাত্র কয়েকটি সংখ্যার ব্যবধানে তোমাদের প্রশ্ন গুলোর উত্তর পর পর আলোচনা করা হয়েছে। পুরাতন সংখ্যাগুলো থেকে উত্তরটা সংগ্রহ করে নাও, অথবা একটু অপেক্ষা কর, কয়েকটা সংখ্যার পরে পুনরায় আলোচিত হবে।

প্রঃ রিকটার স্কেল কী ? (১) অমিতাংশু পাত্র, হরিদাসপুর—তমলুক-মেদিনীপুর ; (২) মনীন্দ্র জানা ও সুতপা ঘোষ, খালোড়-বাগনান-হাওড়া।

ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপের জন্য ভূ-বিজ্ঞানীরা যেসব স্কেল তৈরি করেছেন, তাদের মধ্যে একটি রিকটার স্কেল। এটির প্রবর্তক কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এফ. রিকটার। ভূকম্পন নির্ধারক যন্ত্র সিসমোগ্রাফের উপর এটি নির্ভর করে এবং তীব্রতা মাপার এই স্কেলটিকে প্রায় সবাই মেনে নিয়েছেন। স্কেলটি চালু হয়েছে 1935 সালে।

স্কেলটি দশভাগে বিভক্ত। অতি মৃদু ভূমিকম্পের পরিমাপ উক্ত স্কেলে মাত্র 1·5থেকে 2। 5 থেকে উপর দিকে তীব্রতাযুক্ত ভূমিকম্প ব্যাপকভাবে ধ্বংস আনায়। 8 থেকে 10 তীব্রতাযুক্ত ভূমিকম্প অতি ভয়ঙ্কর।

প্রঃ মেসন, ভিকণা, পজিট্রন প্রভৃতি কণারা কেমন ধরনের ? এদের ভর ও আধান কেমন ? অতনু ভুঞ্যা, ঝেয়ে-কৈয়ড়-বর্ধমান।

মেসন : কসমিক-র বা মহাজাগতিক রশ্মিতে প্রাপ্ত এক ধরনের অতি সূক্ষ্ম কণিকা। ওরা তিন ধরনের। ধন-তড়িৎ বিশিষ্ট ও তড়িৎবিহীন। এদের ভর প্রোটন ও ইলেকট্রনের মাঝামাঝি। প্রত্যেকেই ওরা ক্ষণস্থায়ী ($2\cdot2\times10^{-6}$ থেকে $2\cdot6\times10^{-8}$ সেকেণ্ড)।

ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্টদের বলা হয় মিউওন বা মিউমেসন (ভর 105·66 Mev)। ধন-তড়িৎ বিশিষ্টরা পাইওন বা পাইমেসন (ভর 139·6 Mev)।

ভি-কণা : মহাজাগতিক রশ্মির উপাদান হিসাবে অতি সূক্ষ্ম তেজঃ কণিকার স্রোত। এরা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বা পরিবেশে বিভাজিত হয় এবং "V" অক্ষরটির মত কৌণিক গতিরেখার দুদিকে বিচ্ছুরিত হয়। তাই এদের অনুরূপ নামকরণ।

এদের বিশেষ কোন তড়িতাধান নেই। ভি-কণার অনুরূপ-কণাকে ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমভাবে তৈরি করাও সম্ভব হয়েছে।

পজিট্রন : ধন তড়িৎ বিশিষ্ট এক ধরনের মৌলিক কণিকা। এরা ভর ইলেকট্রনের সমান হলেও ইলেকট্রনের সম্পূর্ণ বিপরীত কণিকা। জীবনকালও অতি সামান্য—এক সেকেণ্ডের দশলক্ষ ভাগের একভাগ।

একেও প্রথম দেখা গিয়েছিল মহাজাগতিক রশ্মিতে। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে শক্তিকণা রূপেও নির্গত হয়। পার্থিব বস্তু কণার বিপরীত কণাগুলির অন্যতম এই কণাও। অর্থাৎ প্রতিবস্তু বা অ্যান্টিম্যাটারের অন্যতম উপাদান।

প্রঃ স্নায়ুকোষ বিভাজিত হয় না কেন? লোহিত কণিকায় কি নিউক্লিয়াস নেই? ধীরেন্দ্রনাথ মাইতি, বৃন্দাবনচক-মেদিনীপুর।

উঃ সক্রিয় সেন্ট্রোজোমের অভাবে অন্যান্য কোষের মত স্নায়ুকোষ বিভাজিত হতে পারে না। কোন একটি স্নায়ু কোষ বিনষ্ট হলে নিউরোগ্লায়া তার স্থান দখল করে।

জন্মের পরে দেহের কতকগুলো অস্থিতে লোহিত মজ্জায় লোহিত কণিকা উৎপন্ন হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে কিন্তু লোহিত কণিকার কোষে নিউক্লিয়াস থাকে। তবে কালক্রমে অপসারিত হয়ে যায়।

প্রঃ হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিডকে (HF) কাচের পাত্রে রাখা যায় না কেন? শমিত ভৌমিক—আদ্রা—পুরুলিয়া।

উঃ সিলিকা বা বালুর সঙ্গে হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটানো ওর একটা বিশেষ ধর্ম। অ্যাসিডটির সংস্পর্শে সিলিকা সিলিকন টেনাফ্লুরাইডে পরিণত হয় এবং অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি হলে হাইড্রোফ্লুয়োসিলিসিক অ্যাসিড গঠন করে [$Sio_2+4HF=SiF_4+2H_2O$, $SiF_4+2HF=H_2\ SiF_6$]।

কাচের মধ্যে সিলিকা আছে এবং অন্যান্য সিলিকেট লবণও আছে। তাই কাচের পাত্রে ওকে রাখলে কাচ তীব্রভাবে আক্রান্ত হয় এবং ফ্লুয়োসিলিকেটে রূপান্তরিত হয় [$Na_2\ Sio_3+6HF=Na_2\ SiF_6+3H_2o$]। ঐ কারণে HFকে কাচের পাত্রে রাখা যায় না।

প্রঃ জণ্ডিস কেন হয়? জণ্ডিসের মালা পরলে কি জণ্ডিস সেরে যায়? মৃন্ময় বিশ্বাস দমদম, মতিঝিল কলেজ, কলিকাতা-74।

উঃ জণ্ডিস রোগের কারণ সম্বন্ধে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অভিমত, আমাদের দেহের রক্তে যে লোহিত কণিকারা থাকে তাদের মধ্যে থাকে হিমোগ্লোবিন নামে এক ধরনের পদার্থ। এই হিমোগ্লোবিনরা চিরকাল একইভাবে অবস্থান করে না। এটি রক্তে তৈরি হয় এবং স্থায়ী হয় মাত্র চার মাসের মত। তারপরেই হিমোগ্লোবিনরা ভাঙতে শুরু করে এবং তৈরি হয় বিলিরুবিন নামে একটি পদার্থ। সেই বিলরুবিন আমাদের যকৃত বা লিভারের ভেতর দিয়ে মলের সঙ্গে এবং কিছুটা প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। যদি (১) যকৃত থেকে বিলিরুবিন নির্গমনের সময় কোন কারণে বাধা প্রাপ্ত হয়, (২) লোহিত কণিকারা কোন কারণে বেশি পরিমাণে ভাঙতে শুরু করে, (৩) যকৃতের কোন অসুখে অথবা কোন ভাইরাসের দ্বারা যকৃত আক্রান্ত হয় তাহলেই জণ্ডিস হবে।

সচরাচর দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জণ্ডিসের মূলে আছে ভাইরাসের আক্রমণ। ঐ ভাইরাসরা তিন ধরনের। হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস বি, এবং 'এ' অথবা 'বি'র সঙ্গে কোন মিল নেই এমন ভাইরাস "নন এ" ও "নন বি"।

একমাত্র হেপাটাইটিস-এ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত জণ্ডিস ছাড়া অন্যান্যরা খুবই মারাত্মক। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস-এ দ্বারাই ছেলেমেয়েরা আক্রান্ত হয়। কখনও কখনও উক্ত ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত জণ্ডিস সংক্রামক ব্যাধির মত এক একটা বিশাল এলাকায় ছড়িয়েও পড়ে। এটি ছড়ায় জলের দ্বারা এবং মাছির দ্বারা।

এই জণ্ডিস কিন্তু আদৌ মারাত্মক নয়। এটি অতি সহজে এবং আপনা হতেই সেরে যায়। শুধু দরকার হয় দুটি সপ্তাহ পুরোপুরিভাবে বিশ্রাম'। বলা বাহুল্য, ঐ কারণে জণ্ডিসের মালা পরলে জণ্ডিস সেরে যায় বলে প্রচলিত ধারণা বা সংস্কার।

জণ্ডিসের মালা তাই একেবারেই ধাপ্পা। তবে ঐ মালাটা গলায় পরলে মালা আপনিই বাড়তে থাকে বলে—অনেকে অলৌকিকতার গন্ধ পেয়ে থাকেন এবং জণ্ডিসের মালার প্রতি তীব্র আকর্ষণও বোধ করে থাকেন। এটিও একটা ধাপ্পা ছাড়া কিছু নয়। যাঁরা জণ্ডিসের মালা তৈরি করেন, তাঁরাও অন্ধ বিশ্বাসে ভর করে থাকেন বলে নিজেরাই

বুঝতে পারেন না। গুরু-পরম্পরায় ব্যবসাটি চালিয়ে যাচ্ছেন!

জাঁতসের মালা যাঁরা তৈরি করেন, তাঁরা কী সব গাছের কাঁচা কঞ্চি সরু কাঠির গায়ে পাকে পাকে সুতো জড়িয়ে বিশেষ নিয়মে মালা গাঁথেন। কায়দা একটা আছে। যার ফলে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়ার পর অল্প অল্প পাক খুলে এবং বাড়তে থাকে। তাছাড়া কাঁচা কাঠিগুলো শুকতে থাকে বলে পাকগুলো আলগা হয়েও বাড়তে শুরু করে। মজার কথা, রোগীর গলায় মালাটি ঝুলিয়ে দেওয়ার মাত্র একঘণ্টার পরেই বাড়তে শুরু করে দেয়—এবং এটি হয় কায়দা করে পাক দেওয়ার জন্য। একজন সুস্থ লোকের গলায় মালাটা পরিয়ে পরীক্ষা করলেই বুজরুকিটা ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু অন্ধ সংস্কারে বশীভূত হওয়ার জন্য—ঐ সাধারণ পরীক্ষাটিও কেউ করতে এগিয়ে আসেন না।

যে কোন ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত জণ্ডিস সাধারণতঃ দুসপ্তাহ পরে নিরাময় হয়ে গেছে বলে মনে হয়। হেপাটাইটিস-এর বেলায় স্থায়ী নিরাময় হয়, কিন্তু অন্যান্য-দের ক্ষেত্রে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে অতি ভয়ঙ্কর ভাবে। তখন রোগীর জীবনের আশঙ্কা দেখা দেয়। উক্ত কারণে জাঁতসের মালার প্রতি সংস্কার থাকা আদৌ হিতকর নয় এবং এই অভ্যাস মন থেকে মুছে ফেলাই উচিত।

প্রঃ কনজাংটি ভাইটিস রোগটি কী এবং এর প্রতিকারই বা কী! অসীম বিশ্বাস, বগুলা—নদীয়া।

উঃ এটি ভাইরাস ঘটিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সাধারণভাবে ওকে "চোখ ওঠা", "জয় বাংলা" ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এটি মারাত্মক নয়, দিন তিনেকের পরেই সেরে যায়। তবে ছোঁয়াচে বলে, রোগাক্রান্তদের কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত। ওর চিকিৎসা পদ্ধতিও তেমন নেই। চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়ে চোখকে পরিষ্কার রাখতে হয়।

প্রঃ নিউটন ও আইনস্টাইনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? গোলাম কিবরিয়া তালগ্রাম—মুর্শিদাবাদ।

উঃ এ প্রশ্ন অবান্তর। শুধু নিউটন আইনস্টাইন নন, বিজ্ঞানের রাজ্যে অতি সাধারণ আবিষ্কারকে অবলম্বন করে ভবিষ্যতে যুগান্তকারী জিনিসের আবিষ্কার হয়েছে এবং মানবসভ্যতাটাই যেন ওলট পালট হয়ে গেছে—এমন নজির বিরল নয়। গ্যালভানির ব্যাঙ নাচানো কিংবা ফ্যারাডের তামার তার জড়ানো সলিনয়েডের উপর চুম্বককে ধরে গ্যাল-ভানোমিটারের কাঁটার বিক্ষেপ ঘটানোর পরীক্ষা দেখে অনেকেই সেদিন হেসেছিলেন। কিন্তু আজ? ওঁদের অবদান কী কম? অতএব স্ব স্ব ক্ষেত্রে সব বিজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ।

প্রঃ শাঁখা পরা কি বিজ্ঞান সম্মত?

অতনু রায় ও সর্বানী দাস, আড়ংঘাটা, নদীয়া।

উঃ শাঁখা পরার পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। এর সমর্থনে দ্রব্যগুণের দোহাই দিয়ে যদি কেউ কিছু বলেন তা হবে কষ্টকল্পিত এবং সে যুক্তি বিজ্ঞান মানবে না।

প্রঃ ভূত, প্রেত, জিন প্রভৃতিকে বিজ্ঞান কী বিশ্বাস করে? গভীররাতে তেতলার ছাদে প্রতিদিন আমরা কার যেন পদধ্বনি শুনতে পাই! সে শব্দ কী তাহলে?

আসগার আলি খান, খোরদ-সাতগাছিয়া-মেমারি, বর্ধমান।

উঃ নিশ্চয়ই খুব ভয় করে? কিন্তু একটু সাহস করে একা না হোক দু-একজনকে সঙ্গে করে সংগোপনে যদি অনুসন্ধান করতে তাহলে দেখতে বেড়াল, ধেড়ে ইঁদুর, অথবা অন্য কোন প্রাণী অথবা কোন উৎস থেকে শব্দ আসছে। বিজ্ঞানের অভিধানে ভূত নেই, থাকতে পারে না। ভূত সম্বন্ধে সংস্কারটাই মাঝে মাঝে এমনভাবে পেয়ে বসে যে-রাতে একটু শব্দ, কোন কিছু নড়ে ওঠা, ইত্যাদির মূলে খুট করে ভূতের ভয় চলে আসে। আজ পর্যন্ত ভূত প্রেত কটা মানুষের ঘাড় মটকেছে বলতো? তুমি বীরের মত সাহস অবলম্বন করে এবং দুজন বন্ধুর সঙ্গে অভিযান চালাও-নিশ্চয়ই ভূতকে হাতে নাতে ধরতে পারবে। ভূত ধরা পড়লে খবরটা দিও কিন্তু। তবে হ্যাঁ, সাহস হারালে চলবে না। সব সময় মনে রাখবে ভূত নেই।

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী গোপাল ভট্টাচর্য্যের কথাটা বলি শোন। তাঁর ছেলেবেলায় গাঁয়ের এক পোড়ো ভিটে থেকে বৃষ্টি হলে অনেকগুলো আলো দপ দপ করে জ্বলে উঠতো, সবাই বললো, ভূতের আলো। বালক গোপাল একদিন দুজন বন্ধুকে সঙ্গে করে ভূতকে পাকড়াও করতে গেলেন। মাঝপথে আলোর খেলা দেখে বন্ধুরাও কেটে পড়লো অগত্যা গোপাল একা এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, একধরনের ছত্রাক এমন আলো বিতরণ করছে।

[আরও প্রশ্নোত্তর 53 পৃষ্ঠায়]

রঙিন ফটকিরি

অপরাজিত বসু

ফটকিরির সঙ্গে তোমাদের নিশ্চয় পরিচয় আছে। জল পরিষ্কার করার জন্য অথবা দাড়ি কামিয়ে নিয়ে মুখের চামড়াকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য ফটকিরিকে ব্যবহার করতে নিশ্চয়ই দেখেছ। ফটকিরি দেখতে কেমন? সাদা, বড় বড় দানা—অনেকটা মিছরির মতো। দানাগুলির পিঠ মসৃণ, আকৃতিতে একটা বিশিষ্টতা আছে। মোটেই এবড়ো খেবড়ো চেহারা নয় তাদের। এরকম দানাকে আমরা 'কেলাস' নাম দিয়েছি।

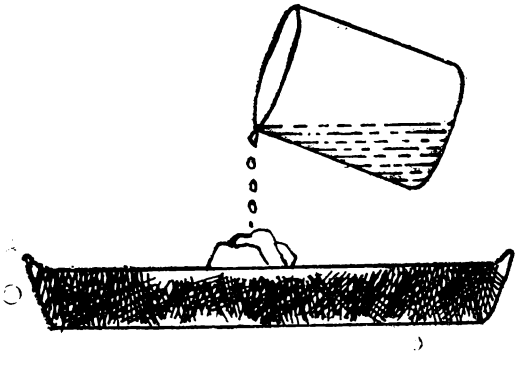

লাল, নীল, সবুজ, বেগুনী রঙের ফটকিরি কি তৈরি করা যায়? যদি তৈরি করা যেত তো কি মজাই না হতো! নানান রঙের, নানান মাপের ফটকিরি তৈরি করে সবাইকে দেওয়ার এ সুযোগ ছেড়ো না। পদ্ধতিটি সহজ, তোমরা বাড়িতে বা স্কুলের বিজ্ঞান ক্লাবে রঙিন ফটকিরি তৈরি করে দেখ, আনন্দ পাবে।

সাধারণ সাদা ফটকিরি বাজার থেকে কিনে গুঁড়ো করে নাও! তারপর অল্প বিশুদ্ধ জলে (বৃষ্টির জল হলে ভালো হয়) তা একটু একটু করে ঢাল এবং গুলে নাও। যখন দেখবে যে ফটকিরি আর গুলছে না তখন আরো কিছুটা ফটকিরি ঢেলে জলটাকে গরম করো। দেখবে, বাকি ফটকিরিটা গুলে গেছে। এরপর তিন-চার ফোঁটা রঙিন সুলেখা কালি (লাল অথবা সবুজ অথবা বেগুনী অথবা নীল) ওতে ঢেলে দাও। যেরকম রঙ ঢালবে সেরকম রঙিন ফটকিরি হবে। এরপর একটা চীনামাটির ডিসে একটা ছোট্ট ফটকিরির দানা বসিয়ে তার উপর একটু (প্রায় এক সি. সি.) রঙিন দ্রবণ ঢাল এবং সমস্ত জিনিসটা সাবধানে নাড়াচাড়া না করে রেখে দাও। পরের দিন দেখবে, দ্রবণটা উবে গেছে, তার জায়গায় জমে আছে রঙিন ফটকিরির কেলাস। পুরনো দ্রবণটা একটু গরম করে আবার প্রায় এক সি. সি. পরিমাণ ঐ রঙিন কেলাসের উপর ঢাল, একদিন রেখে দাও। পরের দিন দেখবে তোমার কেলাস আরো বড় হয়েছে। এইভাবে দিনে দিনে তুমি কেলাসটাকে বাড়িয়ে যেতে পারো। তাহলে? আর দেরি করো না।

লাল, নীল, সবুজ, বেগুনী রঙের ফটকিরির কেলাস তৈরি করার কাজে এখুনি নেমে পড়।

স্কুলের ল্যাবোরেটরিতে না গিয়েই বাড়ীতে বসে—
কম খরচে এবং খুব সহজে হাতে—কলমে
এক্সপেরিমেণ্টের সচিত্র বই

অমরনাথ রায়ের

সায়েন্স এক্সপেরিমেণ্টস

দাম দশ টাকা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৬

হাই-ফাই প্রি-অ্যাম্প

সুব্রত মজুমদার

আমি নিজে একজন হাই-ফাই addict হওয়াতে ছোটো থেকেই ইচ্ছে ছিল যে নিজের হাতে বানানো একটা Stereo Deck ঘরে থাকবে, সময়ে অসময়ে, গান শুনে মন ভাল করব। কিন্তু বাজারে একটা ভাল Stereo-র দাম যা তাতে খুব কম লোকেই এই শখটা মেটাতে পারে। অবশ্য আমার ইচ্ছে ছিল নিজের হাতে বানানোর।

এই কারণে আমি অনেক প্রত্রিকায় দেওয়া Circuit design করা Circuit অনুযায়ী তৈরি করে সন্তুষ্ট হতে পারি নি। কোনো কোনোটাতে তো এত noisy sound আসে যে বলার নয়। কিন্তু Design করা authors-এর মতে ঐটাই নাকি হাই-ফাই প্রি-অ্যাম্প। বেশি নয়, Circuit Diagram অনুযায়ী তৈরি করে Left channel-এর input-এ screw Driver-এর মাথা দিয়ে knock করতেই right channel-এর out-put-এ অবিকল একই আওয়াজ এল, তারপর Stereo Head-এর সাথে দুটো channel যোগ করতেই যা noisy আওয়াজ এল, তাতে আর কি গান শুনে মজা পাওয়া যায়?

অনেক চেষ্টার পর এই সার্কিটটাই আমার কাছে হাই-ফাই প্রি-অ্যাম্প ও low noise প্রি-অ্যাম্প বলে মনে হল। আমার মনে হয় পাঠকরা যারা front loading Mech ব্যবহার করেছেন এবং অন্য IC দিয়ে, বাংলা বা ইংরেজী পত্রিকায় দেওয়া সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী বানিয়েছেন তারা এটা বানালেই পার্থক্য বুঝতে পারবেন।

সব থেকে বড় কথা প্রায় বেশির ভাগ পত্রিকাতেই TDA 2020 দিয়ে সার্কিট দেওয়া হয়েছে কিন্তু কেউ-ই কম দামী হাই-ফাই অ্যাম্প-এর সার্কিট দিতে পারেনি যাতে করে যারা hobbists তাঁরা নিজের হাতে একটা Stereo Deck সস্তায় বানিয়ে নিয়ে গান শুনে আনন্দ পেতে পারে। TDA 1020 IC তো প্রায় ডুমুরের ফুল। এই প্রি-অ্যাম্প-এর সাথে কেবল একটা volume control পর দিয়ে বাজারে যে TDA 1010-এর বোর্ড পাওয়া যায়, তার সাথে জুড়ে দিলে চমৎকার বাজবে আর 150-200 টাকার মধ্যে electronics sectionটা হয়ে যাবে।

যেহেতু এই pre-amp এর-সব ফ্রিকোয়েন্সীর ছটার boosting প্রায় সমান তাই কেবল volume control দিয়ে

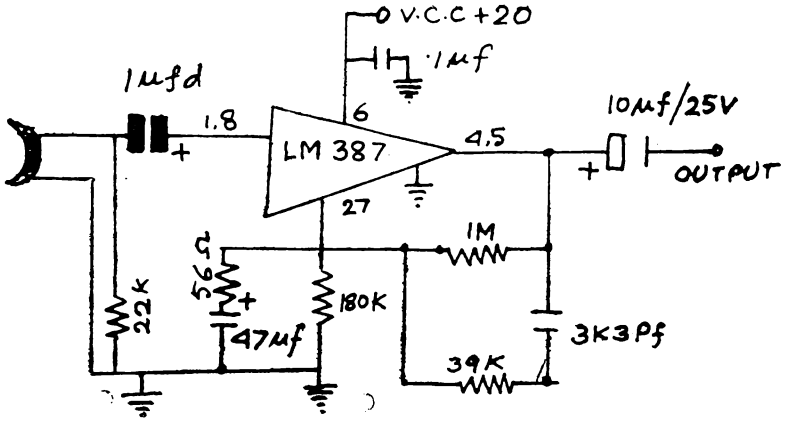

অনেকে আবার বলল এটাই low noise হাই-ফাই প্রি-অ্যাম্প। কারণ LM-382 ইত্যাদি জাতীয় IC দিয়ে বানানো হয়েছে। অবাক কাণ্ড ঐ ধরনের pre-amp এ input যোগ করতেই দেখা গেল output-এ কোনোটাতে Bass frequency-র boosting হচ্ছে High ও Mid freq-এর তুলনায় বেশি, আবার কোনোটাতে যেমন LM-382 দিয়ে তৈরিতে আবার High ও Mid frequency-র boosting বেশি সেই তুলনায় bass frequency-র boostiling প্রায় নেই বললেই চলে। মনের মত একটাও নয়। TDA-1010 বাজালেও এমন কিছু অসুবিধে হয় না। তবে volume control কে optimum condition-এ রাখাই ভাল।

Stereo Head থেকে Input পর্যন্ত থ্রি-কোর সিল্ডেড তার ব্যবহার করা ভাল। নিচে সার্কিট ডায়াগ্রাম দেওয়া হল।

এই LM-384 IC না পাওয়া গেলে আমার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে জবাবী পেস্টকার্ডের সাথে।

102/এ, রেলওয়ে কলোণী, বরাকর-713,328।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত আই কিউ টেস্ট এবং ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1 3 2 প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগী হিসেবে যাদের নাম ঘোষিত হয়েছে—তাদের পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বাৎসরিক অনুষ্ঠানে প্রদান করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ প্রতি বছর এপ্রিলে-মে মাসে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র সফল প্রতিযোগীদের পাঠানো হয় এবং অনুষ্ঠানের বিস্তৃত কর্মসূচী পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠান না হলে সফল প্রতিযোগীদের দপ্তর থেকে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করতে হবে। তাই সফল প্রতি-যোগীদের পত্রিকার পাতায় ঘোষণার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পরিচালক
কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

সফল উত্তরদাতাদের নাম

জানুয়ারি '89-এ প্রকাশিত আই-কিউ টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে দশজন সার্টিফিকেট পাবে ঃ

1. **হিমাংশু পাল** প্রযত্নে, স্নেহাংশু পাল, পোস্ট—চাকদহ (নেতাজী পার্ক) জেলা—নদীয়া।

2. **শিপ্রা পাল** প্রযত্নে, স্নেহাংশু পাল, পোস্ট—চাকদহ (নেতাজী পার্ক) জেলা—নদীয়া-741222

3. **শুভাশিস বিশ্বাস** বগুলা কলেজ পাড়া, পোস্ট—বগুলা, জেলা—নদীয়া, 741502

4. **মিঠু ঘোষ** গ্রাম—মাখালিয়া (পালপাড়া) পোস্ট—বাখরাহাট জেলা—দঃ চব্বিশ পরগণা পিন-743377

5. **কৌশিক বাখণ্ডী** 15/31A, বি.জি. লেন, কলকাতা—700 034

6. **রতন পাল সামুই** প্রযত্নে, ভানু পাল সামুই, গ্রাম+পোস্ট রামনগর, জেলা—হাওড়া, 711312

7. **দেবজ্যোতি দেবনাথ** প্রযত্নে, বীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ, 9, ডঃ এস. পি. মুখার্জী রোড (Ext.) বেলঘরিয়া, কলকাতা-700056

8. **কুন্তল রেজ** প্রযত্নে, প্রভাত কুমার রেজ গ্রাম+পোস্ট—মন্তেশ্বর, জেলা—বর্ধমান, 7131145

9. **বসুমান ঘোষ** B/2-18/4 ভি. কে. নগর দুর্গাপুর—10, বর্ধমান।

10. **সংহিতা চৌধুরী** ফোনঃ নং—LR-251 এ, বি, এল, কলোনি, দুর্গপুর-713206 বর্ধমান।

জানুয়ারি '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-I এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **সৌরভ কুমার দে** 116/2, বেলেঘাটা মেইন রোড, কলকাতা-700010

2. **তন্ময় মহাপাত্র** 56/F বেলেঘাটা মেইন রোড, কলকাতা-700 010

3. **দেবরাজ দত্ত** প্রযত্নে, দীপক দত্ত, বি বি-48/4 সেক্টর-I সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-700 064

জানুয়ারি '৪9-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-I-এণ সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

বীরভুম ঃ অলোক কুমার চক্রবর্তী, দেবায়ন চন্দ্র।

জানুয়ারি '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II-এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **সুব্রত রায়** (দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, সুধীর কুমার রায়, ইন্দা (টায়ার হাউসের নিকট) পোস্ট—খড়গপুর, জেলা—মেদিনীপুর।

2. **তাপস কুমার চক্রবর্তী** (নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, কানু রঞ্জন চক্রবর্তী, হরিণ-ঘাট ফার্ম. পোস্ট—মোহনপুর, জেলা—নদীয়া, 741246

3. **দেবাশীষ পুততুণ্ড** (নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, সুনীল কুমার পুততুণ্ড হরিণঘাট ফার্ম, পোস্ট—মোহনপুর, ইউনিট নং 8, ফোন A—43-44 জেলা—নদীয়া, 741246

জানুয়ারি '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II-এর সর্বাধিক নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে :

24-পরগণা : অরিন্দম মান্না, অঞ্জন চক্রবর্তী।

বর্ধমান : পার্থ কর্মকার।

নদীয়া : অসীম বিশ্বাস।

মেদিনীপুর : কৌশিক গিরি।

বীরভুম : জ্যোতিরিন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী, বিশ্বপ্রিয় চন্দ্র।

জানুয়ারি '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-III-এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে :

1. **দিলীপ দাস** (নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, করুণাময় দাস, গ্রাম—উট পাথর, পোস্ট—নিমপুরা, জেলা—মেদিনীপুর।

2. **কল্লোল রায়** (সাতটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, কমলেশ চন্দ্র রায় গ্রাম—নোয়াপাড়া, পোস্ট—সোনারপুর, জেলা—দঃ 24-পরগণা।

3. **রুণু নিয়োগী** (সাতটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী, গ্রাম-পানপুর, পোস্ট-নায়ায়ণপুর, জেলা—উঃ 24 পরগণা।

স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি, মনের একাগ্রতা বাড়াতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখতে ব্যবহার করুন

রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড—I II III-এর উপহার

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তর-দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

মার্চ '89 সংখ্যার ক্যুইজ কনস্টের উপহার

গ্রেড-1 **সুধাংশু পাত্রের বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ**

গ্রেড-2 **দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথিবী পরিচয়**

গ্রেড-3 **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প**

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট—1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টে উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি.....

.....

বাড়ির ঠিকানা.....

.....

বয়স..... শ্রেণী .....

বিদ্যালয়ের নাম .....

.....

আই কিউ টেস্ট / ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1/2/3-এর উত্তর পাঠালাম।

টি.ভি.—ভি.ডি. ও. এবং সিনেমার প্রভাব

গিরীশ রায় বর্মন

টিভি—ভি.ডি.ও এবং সিনেমা একটাকে বাদ দিয়ে আর একটাকে ভাবা যায় না। এক একটি জিনিষের যেন এক একটি—ভূমিকা রয়েছে।

টি.ভি—বা টেলিভিশন—এই বৈদ্যুতিক যন্ত্রটি বেতার বার্তা ও চলচ্চিত্র দুই কাজই একই সঙ্গে সম্পন্ন করে। 1959 সালের 15 সেপ্টেম্বর ভারতে টেলিভিশন যুগের সূচনা হলেও 1965 সালের 15 আগষ্ট থেকে টেলিভিশনের কর্মসূচী দৈনন্দিন কর্মসূচীতে পরিণত হয়। এখন আমরা ঘরে বসেই টেলিভিশনে দেশ বিদেশের সংবাদ, সমীক্ষা, লোকনৃত্য, লোক সঙ্গীত, বিষয় নির্ভর আলোচনা, সাহিত্য-বাসর, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দৃশ্য ও বিবরণ, খেলাধূলা, সভা সমিতি, জাতীয় উৎসব ইত্যাদির ধরণ ধারণ আবেগ উত্তেজনার স্বাদ সঙ্গে সঙ্গে পাই।

টেলিভিশন দু-ভাবে কাজ করে সতার ও বেতার। উচ্চ-শক্তি সম্পন্ন টেলিভিশন প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে চিত্র ও শব্দ মহাশূন্যের ঈথার সমুদ্রে প্রেরিত হয়। টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্রে মহাশূন্যের ঐ ঈথার আবার চিত্র ও শব্দে পরিণত হয়। একে বলে বেতার টেলিভিশন। স্যাটে-লাইট এর মাধ্যমে দূর দূরান্তের প্রেরিত চিত্র ও ছবি কম শক্তি সম্পন্ন টেলিভিশন প্রেরক যন্ত্রের মাধ্যমে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত টেলিভিশন চালু করা সম্ভব হয়েছে।

1969 সালে আমেরিকার চন্দ্র লোক বিজয়ীদের নানা-ভাবে সাহায্য করেছিল এই টেলিভিশন। অভিযাত্রীরা গবেষণার সুবিধার জন্য চন্দ্রে শক্তিশালী টেলিভিশন প্রেরক যন্ত্র স্থাপন করে আসেন। এর সাহায্যে এখনও নানা রকমের গবেষণা চলছে।

সতার টি.ভি. কে ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন বলে—বড় বড় রেলওয়ে ষ্টেশনগুলিতে ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশনের সাহায্যে ট্রেনের সময় সূচী প্রদর্শিত হয়। অপারেশন রুম, কয়লাখনির ভিতরে কিংবা দুর্গম স্থানে এই টিভির প্রেরক যন্ত্র স্থাপন করে নীরাপদ স্থানে গ্রাহক যন্ত্র স্থাপন করে ঐসব স্থানের পরিস্থিতিলক্ষ্য করা হয়। প্রেরক যন্ত্রের সঙ্গে গ্রাহক যন্ত্রের সংযোগ কোয়েকশিয়্যাল কেবলের মাধ্যমে ঘটানো হয় বলে একে ক্লোজড সার্কিট টি.ভি. বলা হয়।

ভিডিও—এই ব্যবস্থার ফলে প্রেরক যন্ত্রের দরকার হয় হয় না। ফিল্মে গৃহীত চিত্র ও শব্দ সরাসরি ভিডিও—যন্ত্রের সাহায্যে টিভিতে প্রদর্শীত হয় এতেও শব্দ ও চিত্র দুটোই থাকে। সম্প্রতি টিভি বা ভিডি.-ওর কল্যাণে সিনেমার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে সত্যি কিন্তু তাই বলে সিনেমার গুরুত্ব আদৌ কমেনি। উন্নতিশীল দেশেও নানা প্রকার গঠন মূলক কাজে সিনেমার ভূমিকা আজও অপরিহার্য্য রয়েছে। শিক্ষার উন্নয়নে, আমোদ প্রমোদ ছাড়াও দেশ ভ্রমণের স্বাদ আমরা এই সিনেমায় পাই। সময়, শক্তি কিংবা অর্থের অভাবে যাঁরা দেশ ভ্রমণে যেতে অক্ষম তাঁদের সামনে সিনেমা ভ্রমণের আনন্দ পরিবেশনের ক্ষমতা রাখে। সুতরাং টেলি-ভিশনের সঙ্গে সিনেমার মূল পার্থক্য হলো—টেলিভিশনে কেবলমাত্র চলয়মান ঘটনারই প্রদর্শক। সিনেমা বর্তমানকে সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরতে না পারলেও বর্তমানকে ধরে রাখতে পারে ভবিষ্যৎ এর জন্য। এই কারণে সিনেমার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ঠ্য সব সময়ে স্বীকৃত থাকবে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় সিনেমা বা চলচ্চিত্রকে যেন ইদানীং আমরা বিলাসের সামগ্রীতে পরিণত করছি। জাতি গঠনে কিংবা চিত্ত উদ্বোধনে চলচ্চিত্র বা সিনেমার ভূমিকা যেন ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। দেহকামনার—উল্লসিত ছবিই—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভিডিও তে যেন প্রদর্শীত হয়।

টিভি—ভিডি.ও কিংবা চলচ্চিত্র বা সিনেমাকে জাতি গঠন ও চিত্র উদ্বোধনের কাজে প্রয়োগ করতে না পারলে মনে হয় এ গুলির ভূমিকা সমাজের কল্যাণে মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

---

232 নং ভবানীপুর, খড়্গপুর—721301।

রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ
কর্তৃক নির্বাচিত ১৯৮০-১৯৮৮

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
বনে জঙ্গলে ১৫.

অন্নদাশঙ্কর রায়
হট্টমালার দেশে ৮.

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
পশুপাখী কীটপতঙ্গ ১০.

সুনির্মল বসু
রোমাঞ্চের দেশে ৬.

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তেপান্তর ২৫.

অমরনাথ রায়
জ্ঞানবিজ্ঞানের মজার খেলা ১০.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্দীপন পাঠশালা ১০.

অমরনাথ রায়
সংখ্যা নিয়ে খেলা ৮.

আর্থার কোনান ডয়েল
কিশোর রচনা সমগ্র ২৫.

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
খুকুমণির ছড়া ১৫.

সমরজিৎ কর
স্টুডেন্টস বুক অব নলেজ ৫০.

অমরনাথ রায়
স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ১০.

বিমান বসু
নক্ষত্র পরিচয় ১০.

অমরনাথ রায় ও অন্যান্য
সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস ১০.

ক্যুইজ সেট্ ৫০.

পার্থসারথি চক্রবর্ত্তী
বুদ্ধি নিয়ে খেলা ১০.

মণি বাগচি
জীবনী শতক ৩০.

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন ১২.

সমরজিৎ কর
নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী ২০.

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

জগদীশ চন্দ্র বসু
অব্যক্ত ১৫.

অন্নদাশঙ্কর রায়
বিন্নি ধানের খই ১০.

লীলা মজুমদার
বনজঙ্গলের গল্প ১৫.

বিমান বসু
গ্রহ পরিচয় ১৫.

সমরজিৎ কর
মহাকাশ গবেষণায় ভারত ১৫.

ছোটদের বইয়ের স্বপ্নরাজ্য
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৯

R/No 37390/81 KISHORE JNAN BIJNAN REGD NO WBEC 316 8TH YR VOL1

উচ্চমাধ্যমিক ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স
পরীক্ষার্থীদের জন্য

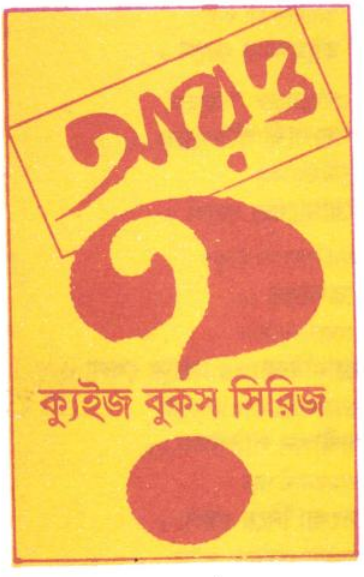

রতন মোহন খাঁ
আরও গণিত ক্যুইজ
সমীরকুমার ঘোষ
আরও ফিজিক্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায়
আরও সায়েন্স ক্যুইজ
তারকমোহন দাসও
অসিত কুমার দাস
আরও বায়োলজি ক্যুইজ

প্রতিটি দশ টাকা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৮এ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১২ দাম : 4·50 টাকা।